তিস্তা নিয়ে সমঝোতা বা কুম্ভীরাশ্রু নয়, চাই আসু বিজ্ঞানভাবনা

এখন ডুয়ার্স

১-১৫ মে ২০১৭। ১২ টাকা

মে দিবস আসে যায় চা-শ্রমিকদের শোষণের দিন বদলাবে কবে?

কোচবিহার রাজবাড়ির টয়লেট ফেটে বেরিয়ে আসছে মল, দর্শকের নাকে রুমাল

৪র্থ বর্ষে

উত্তরের 'রয়্যাল' বেঙ্গল সাফারি

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা আমাদের জীবনকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দিয়েছে, কিন্তু তার সাথে অনেক অসুখও এনে দিয়েছে।
তার মধ্যে **কোষ্ঠকাঠিন্য** অন্যতম.................

কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে ৪ টি টিপস্ ঃ-

১. প্রচুর জল খান, প্রতিদিন অন্তত ৩ লিটার।

২. দৈনন্দিন খাবারে ফাইবারযুক্ত খাবারের মাত্রা বাড়ান।

৩. মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৪. রোজ অন্তত ৩০ মিনিট শরীর চর্চা করুন।

Issued for the public interest by **Pharmakraft**

From the makers of :

PICOME Susp.

জলপাইগুড়ি পৌরসভা

জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদের উদ্যোগে এবং মা-মাটি-মানুষের সরকারের ঐকান্তিক সদিচ্ছায় জলপাইগুড়িতে গড়ে উঠেছে বিশ্ববঙ্গ ক্রীড়াঙ্গন। পাশ দিয়ে বয়ে চলা করলা নদীর দু'ধার বাঁধিয়ে সুন্দর মনোরম পরিবেশ গড়ে তুলে জায়গাটিকে জনগণের জন্য আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি। ইতিমধ্যে নানানরকম খেলা যেমন সম্পন্ন হচ্ছে, তেমনই বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণও চলছে। বিশ্ববঙ্গ ক্রীড়াঙ্গনের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটি শহরের বাইরে চলে গিয়েছে, সেটিকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য করলার উপর ব্রিজটি এই পৌরসভার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্রিজটির ফলে বাইরে থেকে খেলতে আসা ক্রীড়াপ্রেমীদের পক্ষে শহরের যে কোনও জায়গা থেকে সময়মতো এখানে পৌঁছাতে কোনওই বেগ পেতে হয় না।

শ্রীমতী পাপিয়া পাল
উপ-পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

শ্রী মোহন বোস
পৌরপতি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ?
নাকি আরও অনেক কিছু ?

চা-টা। আড্ডা। দাবা-ক্যারম-টেবিল টেনিস। পার্টি। গেট টুগেদার।
সেমিনার। বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা। শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭
পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১
ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

ছ'মাসের এককালীন সদস্য নেওয়া হচ্ছে

বেয়াড়া চালাও ফোয়ারা
দ্যাখো চোখে চোখে সর্ষে ফুল

সম্পাদকের ডুয়ার্স

বিবৃতি ১— 'শুনুন ভাই, আপনার বাড়ির কলেজে পড়া ছেলেটি বা মেয়েটি বন্ধুদের সঙ্গে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নাকি? সারাদিন গাধার খাটুনি খেটে সন্ধেয় বাড়ি ফিরে কত্তা যদি একটু সোডা হুইস্কি নিয়ে বসেন তো দোষের কী আছে শুনি? আর যা-ই হোক, ঘরেই তো থাকেন, পাশের বাড়ির অমুকবাবুর মতো বেপাড়ায় যান না, বুঝলেন! আর বাপের দেখাদেখি ছেলেও যদি মাঝেমধ্যে পড়া ছেড়ে গেলাস নিয়ে একটু 'পেসাদ' আবদার করে তো দুনিয়া রসাতলে চলে গেল? যা-ই বলো, দু'-একবার কয়েক চুমুক খেয়ে দেখেচি ভাই, শরীলটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যায়, না চাখলে বিশ্বাসই করতুম না!'

বিবৃতি ২— 'সত্যি বলছি, গিন্নিকে এই বেলায় সাপোর্ট না করে পারছি না। আদালতের রায়ের ফাঁক গলে মদের দোকান ফের চালু শুনে গেল গেল রব তোলার কী আছে, মাথায় ঢোকে না দাদা! বিহার মদ বন্ধ করেছে বলে আমাদেরও তা-ই করতে হবে? বাংলা শেষ অবধি বিহারকে ফলো করছে? তা মেনে নেওয়া যায়? আর মদ চালু রেখে মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক-কেরালা সব কি উচ্ছন্নে চলে গিয়েছে? নাকি এতদিন মদ বন্ধ রেখে গুজরাত সত্যযুগে পৌঁছে গিয়েছে? হ্যাঁ, অতিরিক্ত মদ্যপান নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে হলে সিগারেটের প্যাকেটের মতোই বোতলের লেবেলেও বড় বড় করে ছবিসহ ছেপে দাও— 'মদ খেলে লিভার পচে মরে যেতে হয়।' ঠিক বলেছি কি না বলুন? হ্যা হ্যা। আমরা লেখাপড়া খুব একটা শিখিনি দাদা। সোজা কথা হল, খেটে খাই, তাই মদ খাই। ব্যাস। আর নেশা বলছেন? গুরুই তো কবে বলে দিয়েছেন, নেশা যদি মদেই হত তবে তো নাচত বোতল। হ্যা হ্যা হ্যা।'

বিবৃতি ৩— 'আসলে সবাই বোধহয় ব্যাপারটা জানেন না, সেই বাম-আমল থেকেই এ রাজ্যে শপিং মলে বিয়ার-মদ বিক্রির ভাবনা শুরু হয়। উদ্দেশ্য অসাধু কিছু নয়— রাজ্যের আয় বাড়ানো! তৎকালীন বামপন্থী অর্থমন্ত্রী সম্ভবত টের পেয়েছিলেন, এ বাংলায় মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে 'জলীয় সংক্রমণ' চালু হয়ে গিয়েছে। সর্বহারার সাড়ে তিন দশক পেরিয়ে, সর্বস্ব হারিয়ে বাঙালির এখন কেবল বুঁদ হয়ে থাকার সময়। সন্ধে নামতেই রসে নিমজ্জিত হয় দুই বাংলার মানুষ। (ওপার বাংলায় মদ নিষিদ্ধ বলে কুছ পরোয়া নেহি, এপার থেকে চোরাপথে বস্তায় বস্তায় পৌঁছে যাচ্ছে বোঝাই কাফ সিরাপ। ছিপি খুলে গলায় ঢালো। ব্যাস, দিনভর নির্বাণ।) দারিদ্র, বেকারি, দুরাচার কোনও কিছুই স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে। দোহাই, একে আবার 'স্রেফ নেশা' হিসাবে ব্যাখ্যা করে বসবেন না কেউ, এ হচ্ছে এক ধরনের পরিত্রাণ। যাবতীয় বেদনা-দুঃখ, দায়িত্ব-চেতনা, ক্ষোভ-হতাশা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার সহজতম পথ। নিন্দুক সমাজবিজ্ঞানীরা একে হয়ত 'শাসকের সুপরিকল্পনা' আখ্যা দেবেন, কিন্তু তাতে কারও কিছু আসে-যায় না। কারণ, বলবার মতো জিহ্বা কিংবা শোনবার মতো কান আর দেখবার মতো চোখ আজ একে অপরের স্নায়ুস্পর্শ থেকে অনেকটা দূরে।' আজ বরং কবিগুরু থাক, আসুন বাংলার মহানায়কের জনপ্রিয় ছায়াছবির গানের দু-কলি আউড়ে নিই— মদ্যপানের বিরুদ্ধে যারা তাদের মাথায় পড়ুক বাজ... খাও খাও বুঁদ হয়ে ডুবে যাও...'

চতুর্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১-১৫ মে ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স ৫
দূরবিন ৯
রাজনৈতিক সমঝোতা বা কুম্ভীরাশ্রু নয়, উত্তরবঙ্গ চায় তিস্তা নিয়ে আসু বিজ্ঞানভাবনা
উত্তরপক্ষ ২৭
উত্তরের অর্থনীতিতে পরিবহণ ব্যবসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে
চায়ের ডুয়ার্স, ডুয়ার্সের চা ১৪
মে দিবস আসে যায়, শোষণ চলতেই থাকে চা-শ্রমিকের দিন বদলায় না
কোচবিহার থেকে কালিম্পং ১৮
রাজবাড়ির টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছে কাঁচা মল, দর্শকের নাকে রুমাল
লাটাগুড়ি কার্নিভাল ১৯
হুল ফোটালেও পাহাড়ে দাঁত বসাতে পারবে তৃণমূল? ২১
পর্যটকের ডুয়ার্স ২২
উত্তরের 'রয়্যাল' **বেঙ্গল সাফারি** মুক্ত চিড়িয়াখানা শিলিগুড়ির গর্ব
পর্যটকের পরিক্রমা ৪০
তিনবিঘা ও তার আশপাশে এক বিকেলে
ডুয়ার্স তরাই শতাব্দী এক্সপ্রেস ৩১
শত কৃতীর আলোয় উজ্জ্বল দিনহাটার প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ২৪
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৩
তরাই উৎরাই ৩৬
ডুয়ার্স থেকে শুরু ৩৮
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩
নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৯
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্সের ডায়েরি ১২
ডুয়ার্সের অনাদৃত রতন ৪২
কাজীমান গোলে

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ শান্তনু সরকার
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস,
প্রকাশনা প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রভিডেন্ট ভূত

এই মরেচে! প্রথমে কোচবিহারে, তারপর মালদায়। দুই জেলার শিক্ষকরা নাকি পিএফ ব্যালেন্সের খোঁজ করতে গিয়ে প্রায় মূর্ছা যাচ্ছেন। পিএফ-এ কোনও টাকা নেইকো! ট্রেজারির খাতায় ফুটো পয়সাও নেই শিক্ষকদের ভবিষ্যনিধি তহবিলে। শুধু এটাই নয় রে পাগলা! স্কুলের নাম পর্যন্ত নেই খাতায়! তহবিল ভেঙে লোন নিতে গিয়ে নাকি এসব টের পেয়েছেন কিছু শিক্ষক। জেলাশাসকও নাকি চিন্তিত মুখে বলেছেন, তা-ই তো! টাকা গেল কোথায়? তা খুচরো রচনা পর্যন্ত তেড়ে অনুসন্ধান চলছে। বলা হচ্ছে যে, টাকা কেউ খেয়ে ফেলেনি। নির্ঘাত কোনও গন্ডগোলে কোথাও লুকিয়ে আছে। তা বাপু লুকালে তাড়াতাড়ি বার করিস! টাকা তো জড়বস্তু! সে কি ভূত হতে পারে?

মৌচাকাণ্ড

আর বলিস না! জানলার কার্নিসে তিন তিনটে মৌমাছির চাক। আর সে কী তাদের সাইজ! বারোবিশার এক প্রাথমিক স্কুলের জানলা সেটা। ফলে গোটা একখানা ক্লাসরুম অকেজো! জানলা খুলে ক্লাস করলে মাছিবাহিনী উত্তেজিত হয়ে টহল দিতে থাকে। জানলা বন্ধ করে দিলে গরমে আলু

সেদ্ধ। আর এমনিতেই একটা ঘরে দুটো ক্লাস বসে অতি কষ্টে। সুতরাং চারটে ক্লাস বসলে ঠাসাঠাসি করার ব্যাপারে চাকের মাছিরাও লজ্জা পাবে। অতএব স্কুল প্রায় লাটে। এবার সমস্যা হল, মৌমাছি বিতাড়নের পুণ্য দায়িত্ব কারা নেবে? বন দপ্তর নাকি চাক ভাঙার কথা শুনলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকছে। থাক তবে চাক! কী আর করা!

মাউসমসস্যা

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে যারা পড়াশোনা করে, তারা সবাই দোপেয়ে নয়। স্রেফ কৌশল করে, সিদ্ধিদাতার কাছে বুদ্ধি নিয়ে গুচ্ছের চারপেয়ে পড়ুয়া জ্ঞান অর্জনে অপরিসীম আগ্রহ দেখিয়ে যা কাণ্ড করছে, তাতে কলেজের করোনারি থ্রম্বোসিস হওয়ার জো! এদের সিলেবাস আবার

বিচিত্র! যেমন কীভাবে দামি যন্ত্রের তার কেটে রাখতে হয়, পরীক্ষার জন্য প্যাকেট করা স্যাম্পেল কীভাবে ফুটো করতে হয়, লাশকাটা ঘরে চিৎপাত মৃতদেহে অতিরিক্ত কাটাছেঁড়া করার কী নিয়ম, অপারেশন থিয়েটারে আচমকা হাজির হয়ে ডাক্তারকে ঘাবড়ে দেওয়া— এইসব। কিন্তু তাদের খতম করা যাবে না। ফলে রাস্টিকেট করার জোর আয়োজন চলছে কলেজে। হরেক লোক হরেক বুদ্ধি দিচ্ছে। কিছু একটা নির্ঘাত হবে— অন্তত দোপেয়ে ছাত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু তো একটা করতেই হবে! কিন্তু ওরা কারা? সে কী কত্তা! কম্পিউটার পেটান আর মাউস চেনেন না?

নাহি যাব

শিলিগুড়ির কাছে বেঙ্গল সাফারি পার্কে আহত বুনো পশুপাখির চিকিৎসে হয়। রোগীর অভাব নেই। গাছ থেকে পড়ে যাওয়া পেঁচার ছানা, ভিরমি খাওয়া চিল, শুগার বেড়ে যাওয়া হরিণ, ডানায় আর্থ্রারাইটিস হওয়া টিয়া— সব মিলিয়ে আউটডোর হাউসফুল। তা সেবা পেয়ে সুস্থও হয়ে ওঠে সবাই চটপট। কিন্তু সুস্থ শরীরে কোথায় ঘরের বুনো ঘরে ফিরে যাবি তা না, উলটে হাসপাতালকেই ঘর বানিয়ে ফেলছে তারা। ছেড়ে দিলেও ফিরে আসে, উড়িয়ে দিলেও তা-ই। ফলে সুস্থ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে সাফারি পার্কে। এখন চিন্তার বিষয় হল, হাসপাতালের সুখ্যাতি বনালয়ে ছড়ালে রোগীর সংখ্যা হু হু করে বৃদ্ধি পায় কি না!

দেশদ্রোহী চিতা

বীরপাড়ার কাছে কয়েকটি চিতার ডেডবডি মিলেছে। গেরস্তের ছাগলগুলো টুকটাক ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার কারণে কে জানি পটোল তোলা গোরুর শরীরে বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল। সেই খেয়েই প্রয়াত হয়েছে চিতারা। কিন্তু এ নিয়ে এত আদিখ্যেতার কী আছে শুনি? হিন্দুর দেশে লুকিয়ে গোমাংস খাওয়ার এটাই যে শাস্তি তা বুঝি জানো না? চিতা হয়েছে তো কী হয়েছে? বন বিভাগ অবশ্য চিতাকে দেশদ্রোহী বিবেচনা না করে জোর তল্লাশি শুরু করেছে। জানা গেল, যে ব্যক্তি মরা গোরুর শরীরে বিষ মিশিয়েছিলেন, তিনিও ভ্যানিশ। এখন কথা হল যে, পটোল তোলা গোরুর শরীরে বিষ মেশানোটা গোমাতার অবমাননা সংক্রান্ত মামলায় পড়ে কি না। শোনা যাচ্ছে, কারা জানি এর মধ্যেই ময়দানে নেমে মাথায় ফেট্টি লাগিয়ে বেদ-বেদান্ত-স্মৃতি-মনু-সংহিতা-পুরাণ-মহাকাব্য ঘেঁটে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, 'বোথ চিতা অ্যান্ড পয়জন মেশানো ব্যক্তি হয় দেশদ্রোহী!'

ধূপকাউগুড়ি

এটাই নাকি হতে চলেছে ধূপগুড়ির ভবিষ্যৎ নাম। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে নাম বদলে করা হবে 'বাইকগুড়ি'। কারণ সে শহরের রাস্তা বাইকে বাইকে ছয়লাপ হয়ে থাকে কি না! তুচ্ছ পদব্রজী জনতা কোনওমতে লাফিয়ে, উড়ে, শরীর বাঁকিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু বাইকের সংখ্যাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গোরুরাও যে দল বেঁধে পথে নামবে তা কে জানত! ফলে ধূপগুড়ির পথে নামলেই কানে আসবে 'খট খট খট খট'। চার পায়ে হিল জুতো পরে নির্বিকার

চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাশি রাশি গোরু। পবিত্র গোবর আর গোমূত্রে স্বর্গীয় করে তুলছে শহরের পরিবেশ। একে-তাঁকে গুঁতিয়ে হাসপাতালেও পাঠাচ্ছে। সুতরাং, শহরের নামের মাঝে 'কাউ' শব্দের আমদানি হল বলে। তবে আগে থেকে এসব কাউকে বলবেন না যেন!

আবার গো

হ্যাঁ গো! গো ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাচ্ছ না গো? তা প্রিয়ে পাচ্ছি কই! এই সে দিন কারা জানি চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তের দিকে গাড়ি বোঝাই গোরু লুকিয়ে নিয়ে আসছিল। আগাম সন্দেশ পেয়ে পুলিশও ঘোরাঘুরি করছিল গাড়ি চেপে। বিপদ বুঝে গোরুর গাড়ি স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সোওজ্জা এক গুদামে। পুলিশে আর খোঁজাখুঁজি করে পায় না! কিন্তু কে জানি বিএসএফকে জানিয়ে দিল যে, গোডাউনে গো। বিএসএফও জলদি জলদি গো! একদম হাতেনাতে পাকড়াও গো! তারপর তো খোঁজ পড়ল গোডাউন মালিকের। কী কাণ্ড! তিনি আবার পদ্মনেতা! ব্যাস! হইহল্লা সিটি প্যাঁক তক্ক ঝগড়া! শুনেছি, শেষে নাকি গো-এষণা করে গোধূলিলগ্নে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে।

নাই

সত্যি কথা মামা! দশ দশটা কোটি টাকা খরচা করে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দিয়ে রাজকাহিনি প্রদর্শনের জন্য রেডি হয়ে আছে কোচবিহার রাজবাড়ি, কিন্তু কেউ আসছে না। মানে বানাতে কেউ আসছে না। এমন কেহই নাহি, যিনি উক্ত দশ ক্রোড়ের বিনিময়ে ধ্বন্যালোক দ্বারা কোচবিহার রাজেতিহাস বর্ণিবেন। এমন একখানা জবরদস্ত জিনিস বানাতে ঠিকাদারদের উদাসীনতা দেখে ভারী সমস্যায় পড়েছে গমেন্ট। কিন্তু কেন ঠিকা গ্রহণে এহেন পরাঙ্‌মুখতা? বিজ্ঞজনেরা নাকি বলছেন যে, কাজ মোটে এলেবেলে নয়। যিনিই করুন, রীতিমতো পড়াশোনা করে করতে হবে। সে ক্ষেত্রে দশ কোটি নাকি তেমন কিছু ইয়ে নয়।
ইট-কাঠ-বালি-পাথরের বাইরে এমন অনেক কিছু চাই, যাতে খচ্চা আছে। তা-ই? জানিনে রে ভাই! তবে আপাতত ঠিকাদার নাই।

টুক্রাণু

মালবাজারে পানীয় জল বাড়ন্ত, মশা অসীম। নতুন বছরে শিলাবৃষ্টির গুঁতোয় চা-বাগান লন্ডভন্ড। বন বিভাগের পাতা চিতা ধরার খাঁচায় আটকে গেল গোবেচারা কুকুর। কবর থেকে খুলি চুরি ফুলবাড়িতে। জটেশ্বরের কাছে সেল্‌ফি তুলতে গিয়ে নর্দমায় দুই কিশোরী। বারোবিশায় চোরদের ভারী আনন্দ, কারণ থানা নেইকো। ঘুমপাড়ানি গুলির গুঁতোয় কোচবিহারের চিল্কির হাটে অকালমৃত্যু দুই বাইসনের। সেনা বনাম পুলিশের হাতাহাতি নাগরাকাটায়। শিলিগুড়িতে ইস্ট বেঙ্গল হেরে যাওয়ায় ডুয়ার্স জুড়ে লাল-হলুদে লোডশেডিং। পয়লা বৈশাখ পালনের উদ্দেশ্যে ময়নাগুড়িতে হাজির একাধিক চিতা।

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

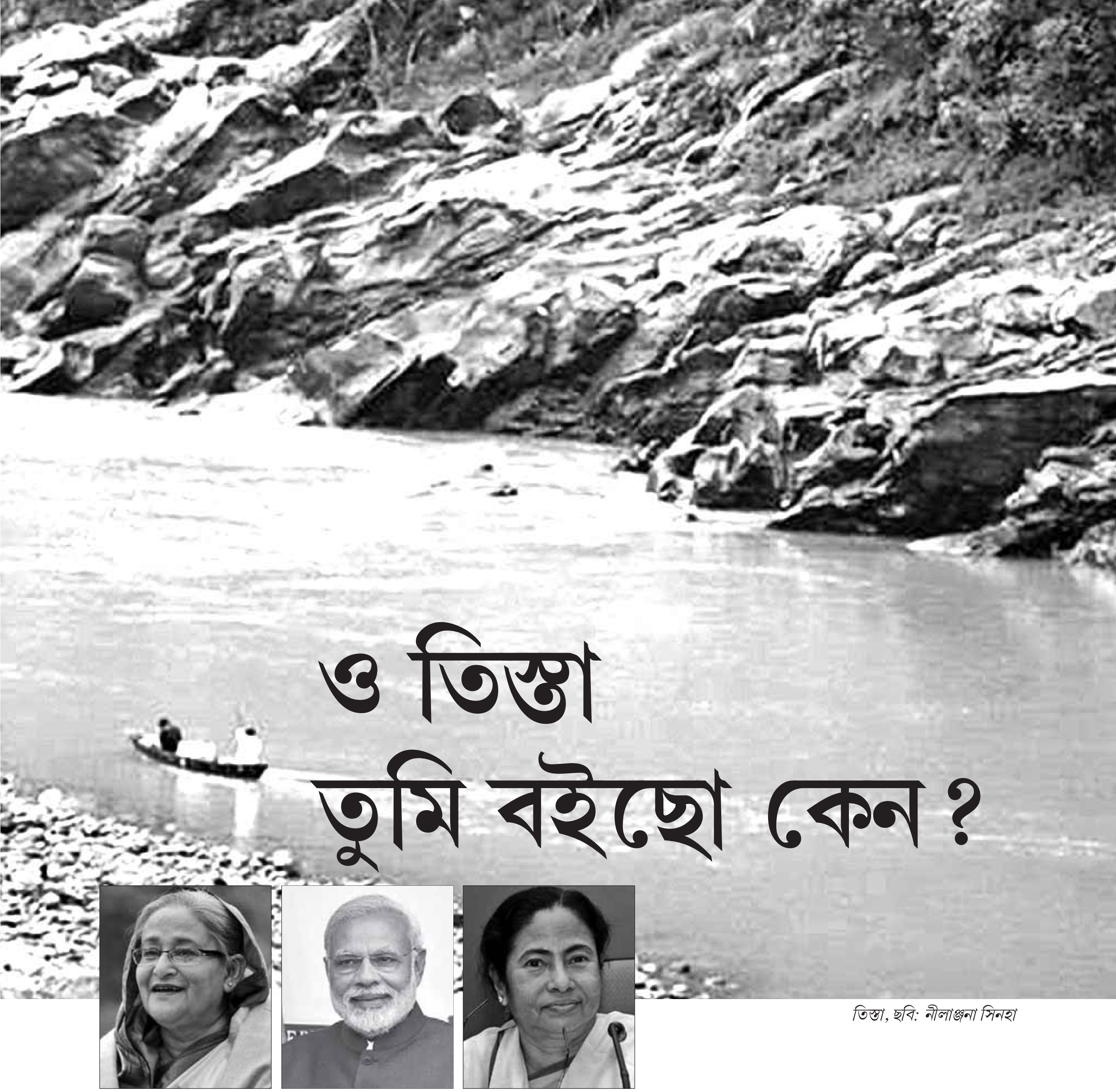

ও তিস্তা তুমি বইছো কেন?

তিস্তা, ছবি: নীলাঞ্জনা সিনহা

তিস্তার আন্তর্জাতিক জলবণ্টন নিয়ে এতদিন টালবাহানা চলার পর আজ রাজনৈতিক সম্পর্কের বাধ্যবাধকতা সামনে এসে হাজির। যে অঙ্কটা আমাদের কাছে মোটামুটি পরিষ্কার। ক্ষমতায় আবার ফিরে আসার জন্য শেখ হাসিনার ঝুলিতে প্রয়োজনীয় ভোট বয়ে আনতে পারে 'তিস্তার পানি'। আবার ওপার বাংলার মৌলবাদী আনাগোনা বৃদ্ধি ঠেকাতে আর বাংলাদেশে অর্থনীতিতে প্রভাব জারি রাখতে মোদিজির প্রয়োজনীয় হাসিনার প্রত্যাবর্তন তথা সন্তুষ্টি বয়ে আনতে পারে সেই তিস্তার জল। অতএব 'যে কোনও মূল্যে' সেই জলকে ওপারে পাঠাতেই হবে, তার জন্য এপার বাংলার ক্ষমতাসীন মমতাকে নরমে-গরমে রাজি করাতেই হবে! অথচ বাস্তবে এপার বাংলার উত্তরাংশের 'লাইফলাইন' সেই তিস্তা এখন এমনিতেই বিপন্ন। আত্মবিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রাকৃতিক সম্পদবাহী এই নদীকে এতদিন ধরে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যার কোনও কেন্দ্রীয় সার্বিক পরিকল্পনা কোনও কালেই ছিল না, যার পরিণাম অচিরেই ভুগতে হবে বিস্তীর্ণ সমতল অববাহিকার মানুষকে। এখন যদি বিজ্ঞান মেনে কোনও সার্বিক সংশোধনী পরিকল্পনা না নেওয়া হয়, তবে তিস্তার জলধারা পরিণত হবে সেইসব অসংখ্য বিপন্ন মানুষের অশ্রুধারায়।

রাজনৈতিক সমঝোতা বা কুম্ভীরাশ্রু নয়, উত্তরবঙ্গ চায় তিস্তা নিয়ে আসু বিজ্ঞান-ভাবনা

সৌমেন নাগ

উত্তরবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার ফারাক্কা ব্যারেজ পার হলেই মালদা জেলা থেকে শুরু হয়ে পূর্বে কোচবিহার জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা স্বঘোষিত উত্তরবঙ্গ। এর স্বঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ি। কোনও ঘোষণারই নেই কোনও বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি। তবু এই এলাকা আপন পরিচয়েই উত্তরবঙ্গ ও তার এক কল্পিত রাজধানী নিয়ে দুয়োরানির মতন জীবনপ্রবাহ পরিচালিত হয়ে চলেছে। আয়তনের বিচারে এটি রাজ্যের মোট আয়তনের ২৪.৬২ শতাংশ। ২০১১ সালের লোকগণনায় সমগ্র রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১৮.৮৩ শতাংশ মানুষ এখানে বাস করে।

উত্তরবঙ্গকে নিয়ে এখন যেন রাজধানীর প্রভুদের অনুকম্পা দেখানোর একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সবার মন যেন উত্তরবঙ্গের জন্য কেঁদে উঠছে। পতিতপাবন হরির মতন রাজধানীর প্রভুরা ঘন ঘন এই ভূমিতে এসে সহানুভূতির অশ্রুপাতে উত্তরবঙ্গের শুষ্ক নদীর বুকে স্রোতের ঢেউ তুলতে চাইছেন। অহল্যাভূমিতে যেমন রামের পাদস্পর্শে শাপগ্রস্ত অহল্যা প্রস্তরীভূত শিলা থেকে প্রাণস্পন্দনের অহল্যাতে পরিণত হয়েছিল, তেমনই শিল্পবন্ধ্যা উত্তরবঙ্গের অহল্যাভূমিতে রামের দেবত্বের দাবি নিয়ে অনেকেই রাজধানী থেকে আসেন। রাজনৈতিক রং যা-ই হোক না কেন, সবারই চোখে গ্লিসারিন মাখা জল। সবার প্রাণই যে কেঁদে চলেছে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য। কিন্তু উত্তরবঙ্গ যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। শোনা যায়, রাজ্যে নানা শিল্প প্রকল্পের ডালি নিয়ে শিল্পপতিদের আসার সম্ভাবনার আশায় রাজধানীর নেতৃত্ব বরণডালা সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু উত্তরবঙ্গের জন্য কোনও শিল্প প্রকল্পের কথা শোনা যায় না। যা কিছু গঙ্গার ওপারে রাজধানীকেন্দ্রিক জেলাগুলির জন্যই ভাবা হচ্ছে। বাংলার এই উত্তর ভাগের জন্য কোনও ছিটেফোঁটার বরাদ্দের আশার কথা কোনও মহল থেকেই শোনানো হয়নি। এখন আবার উত্তরবাংলার নদীসম্পদ নিয়ে চলছে এক রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির খেলা।

কলকাতা বাঁচলে পশ্চিমবাংলা বাঁচবে। কলকাতা হাসলে রাজ্য হাসবে। রাজার বাসভূমিকে সাজালে রাজ্যকে সাজানো হবে— সেই ঔপনিবেশিক ভাবনার মানসিকতাকে মনের মধ্যে বয়ে ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে গঙ্গার জলকে কলকাতা বন্দরের পলিমুক্ত করতে খালের সাহায্যে প্রবাহিত করার অবৈজ্ঞানিক প্রকল্প রূপায়ণের সময় ভাবার প্রয়োজন হয়নি, এই ব্যারেজ রূপায়িত হলে মালদার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে। আজ সেই প্রকল্প যে শুধু ব্যর্থ বলেই প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, এর জন্য প্রতি বছর মালদাকে তার জমিকে নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে দেখে অসহায় আর্তনাদ করতে হচ্ছে। রাজধানীর প্রভুদের ভাবনা, রাজার বাসভূমিকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা তো করতেই হবে। তার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রে কাগজ-কলমে প্রজার অস্তিত্ব না থাকলেও উত্তরবঙ্গের মতন প্রান্ত জেলাগুলোকে কিছু ত্যাগ তো করতেই হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও উত্তরবঙ্গের সংকোশ নদীর জলকে একইভাবে কলকাতা বন্দরে আনার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এর ফলে উত্তরবঙ্গের এক বিশাল বনভূমিসহ প্রায় ৩০টি চা-বাগানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হত। উচ্ছেদ হত হাজারকয়েক মানুষ। তাতে কী? রাজার ভূমি রাজধানীর মুখের হাসি ফোটাতে উত্তরবঙ্গের মানুষের এইটুকু আত্মত্যাগ করাই তো কর্তব্য। ফারাক্কা ব্যারেজের অভিজ্ঞতায় উত্তরবঙ্গের মানুষ জ্যোতি বসুর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে সংকোশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় জ্যোতিবাবুকে পিছু হটতে হয়েছিল।

এবার তিস্তা প্রকল্প

তিস্তাকে বলা হয় একাধারে উত্তরবঙ্গের জীবনপ্রবাহ ও দুঃখ। তিস্তা এখানকার মানুষের আদরের 'বুড়ি মা'। বর্ষায় প্রবল জলস্রোতের টানে বাড়িঘর, স্কুলসহ ভেসে যাওয়ার মধ্যেও তিস্তা উত্তরবঙ্গের ঘরের নদী, ঘরের মেয়ে।

সিকিমের উত্তরে ৬৪০০ মিটার উচ্চতায় লাচেন এবং লাছাং নামে দু'টি হিমবাহের জলে সৃষ্ট একটি হ্রদ থেকে উৎপন্ন তিস্তা সিকিমের পার্বত্য এলাকায় ১৮২ কিমি অতিক্রম করার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। স্থানভেদে তিস্তার অনেক নাম— দিস্তা, স্যাংছু, রঙ্গ, রঙ্গনি উং। লেপচা ভাষায় এই নদীর নাম রংতু। এর অর্থ সোজা নদী। তিস্তা পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় ৮৬০০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে জলপ্রবাহকে বয়ে এনে সমতলে প্রবেশ করেছে। এই নদীটির জলচক্র বেশি জটিল। এটি যে শুধু বরফ-গলা ও বৃষ্টির জলে পুষ্ট তা নয়। ভূগর্ভস্থ জলধারাও একে পুষ্ট করে। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত ২২১৮ মিমি। তবে এর ৭৮ শতাংশই আসে বর্ষাকালে। তিস্তার জলপ্রবাহের সর্বোচ্চ পরিমাণ নথিভুক্ত হয়েছিল ১৯৬৮ সালের ৪ অক্টোবর। সে দিন জলপ্রবাহের পরিমাণ ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১৮১৫০ ঘনমিটার জল। শুখা মরশুমে এই তিস্তার জলপ্রবাহের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় প্রতি সেকেন্ডে ২০ ঘনমিটার।

তিস্তা মূলত পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের নদী হলেও এটি উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ৯৭ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র-যমুনার উপনদী হয়ে তার যাত্রা শেষ করেছে। বাংলাদেশে এর দৈর্ঘ্য ১২৪ কিমি। ব্রহ্মপুত্র আবার চিনের তিব্বতের মানস সরোবরের চেমা-ইয়ংডাম নামে এক বিশাল হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সেখানে এর নাম সাংপো। তিব্বতে (চিন) ব্রহ্মপুত্র ১৬১৫ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছে। ভারতে এর দৈর্ঘ্য ৯১৮ কিমি আর বাংলাদেশে এর দৈর্ঘ্য ৩৩৭ কিমি। আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে কোনও নদীর উপনদী যদি আন্তর্জাতিক নদীর উপনদী হয়ে থাকে, তবে সেই নদীর উৎসভূমির দেশসহ যে দেশগুলি দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে, সেই দেশগুলি সেই নদী পরিকল্পনার প্রশ্নে অংশগ্রহণের অধিকারী। তাই ১৯৬৮ সালে হেলসিঙ্কিতে গৃহীত নীতি মেনে চিন যখন তাদের প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র নদী যেখানে তিব্বত থেকে ভারতে 'ইউ' আকারে মোড় নিয়ে প্রবেশ করেছে, সেখানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার কাজ শুরু করতে চাইল, ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই আপত্তি তুলেছিল। চিনের বক্তব্য, যদিও

ভারত ও চিন ১৯৯৭ সালে আন্তর্জাতিক নদী কমিশনের সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করেনি, তবু তারা সেখানকার গৃহীত নীতি অনুসারে ব্রহ্মপুত্রের মোট জলপ্রবাহের ৫৫ শতাংশ জল নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

এখানেই এসে পড়ে নদীবিজ্ঞানের গোড়ার কথা। নদী একটি প্রাকৃতিক প্রবাহ। সে যখন আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করতে ভিসা বা পাসপোর্টের তোয়াক্কা করে না, তেমনই কোনও দলের প্রতি আনুগত্যের শপথ পাঠ করে তার অনুশাসনকেও মেনে চলে না। সে চলে নিজের গতিতে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে। একটি নদীর অস্তিত্ব নির্ভর করে তার উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের স্বাভাবিক গতির উপর। মানুষ যখন প্রাকৃতিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করে নিজের মিথ্যা দম্ভকে আঁকড়ে ধরে নদীর উৎস বা মাঝপথে প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে তার জলপ্রবাহকে তুলে নিতে চায়, তার প্রতিক্রিয়া পড়ে নদীর উপর সামগ্রিকভাবে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। শরীরের রক্তপ্রবাহকে ঊর্ধ্বাঙ্গে ধরে রেখে নিম্নাঙ্গকে রক্তপ্রবাহ থেকে যদি বঞ্চিত করা হয়, তবে যে সমগ্র শরীরে পচন ঘটিয়ে দেহটাকেই শবে পরিণত করা হয়। নদীর ক্ষেত্রেও প্রতিক্রিয়াটা একেবারে সেরকম। নদী প্রকল্প রচনায় তাই নদীকে সামগ্রিকভাবে উৎস থেকে নিম্নপ্রবাহকে একই সুতোর বাঁধনে এনে ভাবতে হবে।

ভারত চিনের মতোই আন্তর্জাতিক নদীগুলোর জল ব্যবহারের নীতিমালাতে স্বাক্ষর করেনি। তবু সেই নীতি অনুসারে বাংলাদেশকে ১৭ থেকে ২০ শতাংশ জলপ্রবাহ হতে দিয়ে দাবি করতে পারে, সে

বাংলাকে ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তান গঠন করার সময় উত্তরবঙ্গ বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গেরই দিনাজপুর ও রংপুর যে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তাকে তো তিস্তাকে মেনে চলতে বাধ্য করা যায় না। উত্তরবাংলার অপর অংশ সীমান্তের উপর পারের আরেক উত্তরবঙ্গের বৃহৎ অংশ যদি জলের অভাবে শুকিয়ে যায়, তবে তো তিস্তা নদীরই মৃত্যু ঘটতে পারে।

আন্তর্জাতিক বিধিকে মান্যতা দিয়েই তিস্তা প্রকল্পের জন্য জলকে শুখা মরশুমে সংরক্ষণ করছে। প্রশ্নটা যে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রবাহিত একটা নদীর। তিস্তার নিম্নপ্রবাহ রাজনৈতিক কারণে এক ভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বাংলাকে ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তান গঠন করার সময় উত্তরবঙ্গ বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গেরই দিনাজপুর ও রংপুর যে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তাকে তো তিস্তাকে মেনে চলতে বাধ্য করা যায় না। উত্তরবাংলার অপর অংশ সীমান্তের উপর পারের আরেক উত্তরবঙ্গের বৃহৎ অংশ যদি জলের অভাবে শুকিয়ে যায়, তবে তো তিস্তা নদীরই মৃত্যু ঘটতে পারে। হাতের কাছে এশিয়ার দুই বৃহৎ নদী আমুদরিয়া ও সিরদরিয়ার করুণ মৃত্যুর উদাহরণ তো আমাদের হাতের কাছেই মজুত আছে।

এশিয়ার এই দুই বৃহৎ নদীর বিপুল জলপ্রবাহ পৃথিবীর বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ আরল সাগরে এসে পড়ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন রূপকাররা পরিবেশবিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তাকে শুধু অগ্রাহ্য করাই নয়, তাদের প্রগতি বিরোধী আখ্যা দিয়ে কারারুদ্ধ করে 'সাদা সোনা'র সম্পদ তুলো চাষের জন্য বৃহৎ বৃহৎ খালের সাহায্যে এর জল মাঝপথেই টেনে নেওয়া হল। সেচের জলে সাদা সোনার ঢেউ খেলল বটে, কিন্তু উরাল সাগর এই বৃহৎ জলধারা থেকে বঞ্চিত হয়ে ইতিমধ্যেই এক-তৃতীয়াংশ শুষ্ক লবণাক্ত মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ছড়িয়ে পড়ছে মাইলের পর মাইল সেই লবণাক্ত বালু। জমি হচ্ছে চাষের অযোগ্য। ক্যানসারসহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধি তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করে চলেছে দ্রুত গতিতে। বাস্তুচ্যুত হয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষ। নদী দু'টিও তাদের প্রাকৃতিক গতিপথ হারিয়ে মৃত নদী হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক নদী বিশেষজ্ঞরা দফায় দফায় বসেছেন এই নদী দু'টিকে তাঁদের সেই প্রবাহের পথে ফিরিয়ে আনা যায় কি না, তার সম্ভাবনার পথ খুঁজতে। তাঁরা এখন বলছেন, নদী যদি তার স্বাভাবিক গতিপথ থেকে এভাবে একবার সরে যায়, তবে সেই হারিয়ে যাওয়া নদীখাতে নদীপ্রবাহকে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব হয়।

তিস্তাকে নিয়েও ভাবতে হবে একইভাবে। তিস্তা উত্তরবাংলার জীবনপ্রবাহ। বাংলা যদি অখণ্ড থাকত, তখন কিন্তু সমগ্র তিস্তাকে নিয়েই প্রকল্প গ্রহণ করতে হত। ১৯৪১ সালে তিস্তাকে নিয়ে সেই অখণ্ড তিস্তা প্রকল্পের কথাই ভাবা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ অন্য কিছু কারণে সেই প্রকল্প রচনা করা যায়নি। তবু খামখেয়ালি তিস্তাকে বাগে আনার ভাবনা থেকে বাদ দেওয়া যায়নি। ১৯২৩ সালে তিস্তা-মহানন্দা-আত্রেয়ী যে ভয়াবহ বন্যার তাণ্ডব চালিয়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে দেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছিল, তখন থেকেই তিস্তা প্রকল্পের কথা ভাবা শুরু হয়েছিল।

তিস্তা ব্যারেজ

চঞ্চলা তিস্তা

বিহারের কুশি নদী আগে আরও পূর্ববাহিনী ছিল এবং উত্তরবঙ্গের আত্রেয়ী নদীর সঙ্গে এসে মিশত। সেই সময় তিস্তা নদীও এদের সঙ্গে মিশত। একসময় কুশি-আত্রেয়ী-তিস্তার মিলিত প্রবাহ পদ্মার সঙ্গে এসে মিশত। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিস্তা অনেকটা উত্তরে ঘাশিয়া পর্বতের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে। এর পর থেকেই ব্রহ্মপুত্র-যমুনার খাতটির মধ্যে দিয়ে গোয়ালন্দের অপর পারে পদ্মায় তার বিপুল জলরাশি ফেলে চলেছে।

৭০ বছর আগেও তিস্তা জলপাইগুড়ি শহরের পূর্ব দিক দিয়ে বইত। তার গ্রাস থেকে বাঁচতে রেললাইনকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে সরিয়ে আনতে হয়েছিল। এর পরেই দেখা গেল, তিস্তা পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে একেবারে জলপাইগুড়ি শহরে উপস্থিত হয়ে বয়ে চলেছে আদালত এলাকার গা ঘেঁষে। এখন দেখা যাচ্ছে, জলপাইগুড়ি শহরটাকে যেন কিছু ছাড় দিতে সে ধীরে ধীরে দোমোহিনীর খাতে বইতে চাইছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার। নদীর জলপ্রবাহের দু'টি দিক আছে। একটি নদীর খাতপ্রবাহ, যাকে নদীবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় নীল জল। যে জল নদীর উপরের জলপ্রবাহ তাই নীল জল। অপর অংশটি সবুজ জল বা ভৌম জল। এই সবুজ জলই মাটি ও উদ্ভিদকে জল সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রাখে। এই ভৌম জল নদীর বুকের পাথর, নুড়ি-বালির আস্তরণের ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে মাটির তলা দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। তাই নদী সংলগ্ন অঞ্চলে অল্প মাটি খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। গাছ, মাটি ও নদীকে এই ভৌম জল তাই শুখা মরশুমে বাঁচিয়ে রাখে। উত্তরবঙ্গ নিয়ে অনেকেই চোখের জল ফেলেন। অথচ তাঁদের ভাবার সময় হয় না, উত্তরবাংলার এই অঞ্চলের মাটির চরিত্র কী! বালির প্রাধান্যযুক্ত এই এলাকার মাটিকে সতেজ রাখতে ভৌম জলের পরিবহণকে চালু রাখতে এখানকার নদীর বালি ও পাথর অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তবু এখানকার পাহাড়ি নদীগুলোর বুক থেকে পাথর, নুড়ি ও বালি যেভাবে তোলা হচ্ছে, তার প্রতি কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প

সেই ১৯৭৬ সালে রচিত হয়েছিল তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প। তখন ধরা হয়েছিল, ব্যয় হবে ৬৯.৭ কোটি টাকা। বলা হয়েছিল, ৯.২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ৬৭.৫ মেগাওয়াট। ৪১ বছর পার হয়ে গিয়েছে। খরচ হয়ে গিয়েছে ১২০০ কোটি টাকারও বেশি। প্রথম সাব-ফেজ-এর ফেজ-ওয়ানের কাজ এখনও শেষ হয়নি। তবে এই প্রকল্পের টাকায় বহু ঠিকাদার, আমলা ও রাজনৈতিক নেতার চোখ ধাঁধানো সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্নীতির জালে যাঁরা ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই কিন্তু রাজধানীতে বসবাসকারী। এখানে এই প্রকল্পের শেষ ধাপের উদ্দেশ্য খুব বেশি আলোচনার আলোতে আনা হয় না। এই প্রকল্পের শেষ ধাপে খাল কেটে কলকাতা বন্দরের জন্য জল নেওয়ার সেই একই অবৈজ্ঞানিক ভাবনার পুনরাবৃত্তি। অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের মানুষের সামনে যা-ই উপস্থিত করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জলসম্পদকে কলকাতার জন্যই ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নটা হল বন্টনের। কিন্তু তিস্তায় যদি জলই না থাকে, তবে জলবন্টনের প্রশ্নটা চাকরির পদশূন্য দেশে তপশিলভুক্ত পিছিয়ে পড়া বর্গের জন্য সংরক্ষণের গাজর ঝুলিয়ে মন ভোলানোর মতন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তিস্তার জলপ্রবাহ হ্রাসের অন্যতম কারণ সিকিমে ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ। বলা হচ্ছে, বাঁধ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইনে যে জল ছাড়া হয় তা তো তিস্তা প্রবাহে গিয়েই পড়ে। তাই এর জন্য তিস্তার জল হ্রাসের অভিযোগ তোলাটা ঠিক নয়। অথচ ঘটনা হল, টারবাইনে জলপ্রবাহ এবং টারবাইন ইউনিট থেকে জল নির্গমনের মধ্যে নদীপ্রবাহের জন্য জল সরবরাহের ছেদ ঘটতে বাধ্য। এই ছেদের ব্যবধান অনেক সময় লম্বা হতে পারে। শরীরের নিম্নাঙ্গে যদি রক্তপ্রবাহ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে, তবে যেমন মানুষের মৃত্যু ঘটে, তেমনই নদীতে জলপ্রবাহ সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া ঘটে। এ ছাড়া বিদ্যুতের চাহিদা যখন কম থাকে, তখন টারবাইন ঘোরানো বন্ধ থাকে। অর্থাৎ বাঁধ থেকে জল ছাড়া হয় না। ফলে নিম্নপ্রবাহে জলের পরিমাণ ভয়ংকরভাবে হ্রাস পায়। এর ফলে জলজ প্রাণী যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনই জলের উপর নির্ভরশীল মানুষরাও হারায় তাদের রুজি। শুখা মরশুমে সিকিম তিস্তার জলকে ধরে রাখছে। উত্তরবঙ্গের সমতল তিস্তায় জলশূন্য থাকছে। তাই বসা দরকার সিকিমের সঙ্গে।

তিস্তার সমস্যা হচ্ছে একাধারে প্রাচুর্য ও দৈন্যের। বর্ষার জলপ্রবাহে তিস্তা সৃষ্টি করে ভয়াবহ প্লাবন। আবার শুখা মরশুমে জলের অভাবে উত্তরবঙ্গ থাকে তৃষ্ণার্ত। তাই দরকার বর্ষার সেই বিশাল জলকে ধরে রাখার প্রকল্প রচনা। এর ফলে শুখা মরশুমে কী উত্তরবঙ্গ, কী বাংলাদেশ— প্রয়োজনীয় জল পেতে পারবে। সেই বিশাল জলাশয়গুলোকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠতে পারে এক বিশাল রুজি-রোজগারের কর্মকাণ্ড। এর জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হবে, তাদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি এই বৃহৎ জলাশয়গুলোর জলজ সম্পদকে সমবায় প্রথায় মালিকানা দিলে এক লাভজনক অর্থনৈতিক প্রকল্প হতে পারে।

তিস্তাকে তাই রাজনৈতিক মূলধন করা থেকে বিরত থাকা যেমন দরকার, তেমনই উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য এই কুম্ভীরাশ্রুর অভিনয় বন্ধ করাও প্রয়োজন। দরকার উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে উত্তরবঙ্গের সম্পদকে উত্তরবঙ্গের জন্য ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক ভাবনা।

তিস্তার বেহিসেবি ব্যবহার:
সর্বনাশ ঠেকাতে প্রয়োজন ভূগর্ভস্থ জল সঞ্চয় পরিকল্পনা

১

আমরা যারা ডুয়ার্সে বাস করি, শুধু ভৌগোলিক নদী হিসাবে নয়, তিস্তাকে আমরা দেখি মানুষের নদী হিসেবে। এই নদীর অববাহিকার বিভিন্ন উচ্চতায় এক-এক জনজাতির বাস। ত্রয়োদশ শতকে তিব্বত থেকে এক জনগোষ্ঠী নেমে এসে লাচেন ও লাচুঙে নিজেদের গ্রাম তৈরি করে। আমাদের ভাষায় তাদের ভুটিয়া বলে। সাতশো বছরের উপর তারা তাদের এই বাসভূমিতে আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর তিস্তাকে নিয়ে। সাতশো বছরে জীবনযাপন, পোশাক-আশাক বদলেছে। কিন্তু তাদের সমাজ ও প্রশাসন একেবারেই তাদের নিজস্ব। সেই নিজস্বতা ভারতীয় সংবিধান স্বীকার করেছে। তিস্তা-বৌদ্ধধর্ম-কাঞ্চনজঙ্ঘা এই নিজস্বতার প্রধান আধার।

সাধারণভাবে ধরা হয়, তিস্তা সিকিমের অন্তর্গত ৬২০০ মিটার উঁচু পর্বতশিখরের ৎসো লামো জোড়া হ্রদ থেকেই বেরিয়েছে। এই ১৭২১০ ফুটের চাইতে উঁচুতে ভারতে আর কোনও হ্রদ নেই। জোড়া হ্রদ তো নেই-ই। এভারেস্টের প্রথম বেস ক্যাম্প বসানো হয় ১৬০০০ ফুটের একটু উপরে। ৎসো লামো তার চাইতে উঁচুতে। এই হ্রদের পূর্ব দিকে পৌহুলরি পর্বত। এই পর্বতের দিস্তাং খাংসে হিমবাহ থেকে উৎসারিত চাম্বু চু নদীরেখার সঙ্গে ৎসো লামো হ্রদ থেকে নিঃসারিত জল মিশে যায়। এই চাম্বু চু-কেই তিস্তার উৎস ধরা হয়। কেউ কেউ বলেন, তিস্তা তার এই নাম পেয়েছে দিস্তাং হিমবাহ থেকে।

তিস্তা অববাহিকার আর-এক জনজাতি লেপচারা। তারাই নাকি সিকিমের আদিবাসী। দজোনগু এই এলাকার নাম। অনেকে বলেন, সাধারণভাবে উপেক্ষিত এই লেপচারা লোহা-পেরেক ছাড়া বিশেষ এক ধরনের বাড়ি তৈরিতে ও বেতের ঝোলানো সাঁকো বানাতে একক বিশেষজ্ঞ। কাজেই বোঝা যায়, তিস্তার নিজস্ব জনজাতি কীভাবে তিস্তার জীবনের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিতে পেরেছে।

তিস্তা ধরে আরও একটু নিচে নেমে আসা যাক দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে। পর্বতবাস ছেড়ে তিস্তা এখানে অরণ্যচারী। অরণ্যচর কত জনজাতি তিস্তার সঙ্গে নিজেদের জীবন এক করে দিয়েছে। তিস্তা তাদের নতুন নতুন জীবিকা দিয়েছে।

তিস্তা নিজের ভিতর থেকে তৈরি করেছে বড় এক চর। সেই চরের জমি অত্যন্ত উর্বর ও নরম বলে সহজে চাষ করা যায়। তিস্তা মাঝে মাঝেই বন্যায় ভাসায়। চরুয়ারা ভেসে আর-এক চরে গিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করে। নতুন জীবন নয়, সেই চিরকালীন তিস্তা-জীবন। বন্যা যেমন নিয়ে যায় নতুন দেশে, তেমনই পুরনো নিয়মিত অতিথি হয়ে আসে বুনো হাতির পাল। জঙ্গলের মধ্যে তিস্তার মানুষ নাকি হাতির পালের খাওয়ার জন্য আলাদা চাষ করে। এমন সব অলৌকিক কাহিনি শুনতে পাওয়া যায় তিস্তার পাড়ের মানুষদের সঙ্গে কথা বললে। লোকজীবনের ভিতর খুঁজে পাওয়া যায় এক অলৌকিক।

সম্প্রতি জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে তিস্তা খবরের শিরোনামে চলে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা নয়, তার বদলে তোর্সার জলবণ্টন নিয়ে উৎসাহী। কিন্তু এই মনোভাব জল ঢেলে দিয়েছে ঢাকার উৎসাহে। বাংলাদেশ বলছে, তোর্সার প্রস্তাব বিবেচনার উপযুক্ত নয়। ৩৪ বছর ধরে কষ্টকর আলোচনার পরে তিস্তা নিয়ে দু'দেশের কূটনীতিকরা একটা জায়গায় পৌঁছেছিলেন। তাঁরা বলছেন, তোর্সা নিয়ে আবার সেই দীর্ঘমেয়াদি আলোচনা শুরু করার কোনও মানেই হয় না। তা ছাড়া নানা কারণে তোর্সার জল কখনও তিস্তার জলের বিকল্প হতে পারে না।

বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রক বলছে, তিস্তা ও তোর্সার অববাহিকা এক নয়। তিস্তার জল শুকিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে এই নদীর অববাহিকায় একটা বিস্তীর্ণ এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে রংপুর জেলায় একটা গোটা বিভাগ রয়েছে। ভূপ্রকৃতিগত কারণে তোর্সার বাড়তি জল খাল কেটেও আনা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল থেকে তোর্সা ছাড়াও রায়ডাক ও জলঢাকা নদী বাংলাদেশ থেকে বয়ে এসেছে। কিন্তু খুব বেশি দূর না এসে তারা বিভিন্ন নদীতে মিশে যাওয়ায় তিনটি নদীর অববাহিকা ছোট। এই কারণে এগুলো বাংলাদেশে কোনও গুরুত্বপূর্ণ নদী নয়। তিস্তার অববাহিকা কিন্তু অনেক বড়। আর এই অববাহিকায় দ্বিতীয় কোনও বড় নদী না থাকায় তিস্তার জলের কোনও বিকল্প নেই। তোর্সা, জলঢাকা ও রায়ডাকে ভারত বাড়তি জল দিলেও তিস্তা অববাহিকার দুর্দশা ঘুচবে না। এই মুহূর্তে তিস্তা অববাহিকার যা পরিস্থিতি, তাতে এই অঞ্চলে এখনই জল না এলে বড় বিপর্যয় নেমে আসবে যে কোনও দিন।

তিস্তার জলবণ্টন কেন রাজনৈতিকভাবে এতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেই কারণটার বিশ্লেষণে আসার আগে তোর্সা, জলঢাকা ও রায়ডাক— ডুয়ার্সের এই তিনটি প্রধান নদীকে এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক। তোর্সার উৎস হল তিব্বতের চুম্বি ভ্যালি। তিব্বত থেকে ভুটান হয়ে জয়গাঁ দিয়ে প্রবেশ করেছে ভারতে। তারপর বাংলাদেশে ঢুকে মিশে গিয়েছে যমুনায়। তোর্সার দৈর্ঘ্য ৩৫৮ কিমি। বাঁধ বা ব্যারাজ নেই। পাশাপাশি জলঢাকা নদীর উৎস হল সিকিমের বিতাং লেক। সিকিম, ভুটান হয়ে কালিম্পং, জলপাইগুড়ি আর কোচবিহার হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে মিশেছে ধরলায়। জলঢাকার দৈর্ঘ্য ১৯২ কিমি। এদিকে রায়ডাক নেমেছে হিমালয়ের একটি ঝোরা থেকে। ভুটান থেকে ডুয়ার্স ঘুরে কোচবিহার দিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছে এই নদী। দৈর্ঘ্য ৩৭০ কিমি। এই তিনটি নদীর কোনওটাতেই বাঁধ বা ব্যারাজ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এই তিনটি নদী ছাড়াও সংকোশ, কালজানিসহ বেশ কিছু মাঝারি ও ছোট নদী বাংলাদেশে ঢুকেছে।

তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প শুরু হওয়ার পর তা নিয়ে কিছু মহলের আপত্তি ছিল। কিন্তু সরকার তাতে কান দেয়নি। তিস্তা ব্যারাজ নিয়ে যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল তা মোটামুটি এমন—

১) তিস্তার খাত দিয়ে সারা বছরে মোট কত জল প্রবাহিত হয়? ঋতুভেদে সেই প্রবাহের পার্থক্য কত দূর?

২) তিস্তা ব্যারাজে কী পরিমাণ জল আটকানো হবে ও সেচ খাল দিয়ে সেই আটকানো জল কোন ঋতুতে কী পরিমাণে ছাড়া হবে?
৩) তিস্তা ব্যারাজের জায়গা গাজলডোবা থেকে তিস্তার বাংলাদেশে ঢোকার জায়গা— অর্থাৎ ভারতভুক্ত তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্য ৪০ কিমি নদীপথের দুই ধারে জলপাইগুড়ি-ময়নাগুড়ি-লাটাগুড়ি-মেখলিগঞ্জ-হলদিবাড়ি ইত্যাদি পুরনো শহর, নতুন শহর ও বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকা। গাজলডোবার ভাটিতে এই ৪০-৫০ কিমিই হল ভারতের তিস্তা। এই ব্যারাজের জল আটকালে এই পুরো ভারতের তিস্তাই জলহীন হয়ে পড়বে। নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র তিস্তা সম্পর্কে তাঁর অনেকগুলো লেখায় এই কথা বলেছেন।
৪) সিকিমের অন্তর্গত ৬২০০ মিটার উঁচু পর্বতশিখরের জোড়া হ্রদ থেকে তিস্তার উৎপত্তি। সেই মুখ থেকে তিস্তামুখঘাটে মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র খাতে পড়ছে তিস্তা। মোট দৈর্ঘ্য ৪৫০ কিমির মতো। এর মধ্যে ১৬০ বর্গকিমি স্থায়ী তুষার অঞ্চল। ১৭২ কিমি তিস্তার পর্বতখাত। ১০০ কিমি মতো ভারতে। তারও অনেকটা অংশ পর্বতের সানুদেশ। ১৪২ কিমি মতো বাংলাদেশে। কোনও কোনও হিসেবে এটা ১৭৫ কিমি। এই তথ্যগুলো অনেকটা জানা। কিন্তু যেটা একেবারেই জানা নেই, সিকিমে তিস্তা কতটা জল বয়। পাশাপাশি ঝোরা, নালি, খোলা থেকে কতটা জল পেতে পেতে তিস্তা সমতলে নামে। এই হিসেব না পাওয়া গেলে তিস্তার মোট জলের পরিমাণ স্থির করা সম্ভব নয়।
৫) উত্তর সিকিমের লাচুং থেকে দক্ষিণ সিকিমের রংপো পর্যন্ত বেশ কিছু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রস্তাবিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রকের আপত্তি সত্ত্বেও ৬ থেকে ৮টি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হয়েছে। ১৫ মিটার উঁচু বাঁধও দেওয়া হয়েছে। ফলে গাজলডোবার আগেই তিস্তার জল তুলে নেওয়া হচ্ছে। এতে তিস্তার মোট জলের পরিমাণ কত কমছে?
৬) স্থলভুমির ঢাল অনুযায়ী তিস্তার চিরকালীন খাত হল পাঙ্গা-করতোয়া-আত্রাই-যমুনেশ্বরী। ১৯৬৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরাই জানেন, সেবার তিন দিন ধরে সিকিম অববাহিকায় ১৫০০ মিলিমিটার বৃষ্টির জল নিয়ে ২০০০০ কিউসেক জলস্রোত (গড় যেখানে ৪ থেকে ৫ হাজার) নেমে এসেছিল। তার ফল কী হয়েছিল তা আমাদের অজানা নয়।

ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের বিনীত আবেদন যে, নদী নিয়ে বেহিসেবি কাজ ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিপন্ন হতে পারে উত্তরবঙ্গ তথা ডুয়ার্স। সংকটে পড়তে পারে বাংলাদেশও। কাজেই দু'দেশের মানুষের স্বার্থে যেন সব দিক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২

তপ্ত বৈশাখ মাসের প্রবল নিদাঘের মধ্যে খানিকটা বারিসিঞ্চন করল দক্ষিণ সিকিমের পারবিং গ্রাম সংক্রান্ত খবরটা। অদূর ভবিষ্যতে যে জল নিয়ে যুদ্ধ বাধবে পৃথিবীতে, সেটা নিয়ে সচেতনতা গড়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে বহুদিন আগে থেকেই। পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। সেই তিন ভাগ সামুদ্রিক জল অপেয়। কাজেই পান করার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় মাটির নিচে সঞ্চিত জলের উপর। অথচ মাটিতে সঞ্চিত জল ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। সেই কারণে পারবিং গ্রামের খবরটি শুধু ভূতাত্ত্বিকদের নয়, আমাদেরও মনোযোগ দাবি করে।

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং-এই ‘জল ধরো জল ভরো’ প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। উৎসাহিত হয়েছিলেন পরিবেশবিদরা। মনে হয়েছিল, এতদিনে একটা সরকার মাটির তলায় জল সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ করল

দক্ষিণ সিকিমের একটা বড় অংশ সাধারণভাবে খরাপ্রবণ। আমাদের দার্জিলিঙের মতো ওখানকার মানুষও বর্ষা বাদ দিয়ে বছরের বাকি সময়টা প্রবল জলকষ্টে ভুগতেন। এখন আর ভোগেন না। তার কারণ ‘ধারা বিকাশ’। এটি জলসংরক্ষণের একটি মডেল।

দু'ধরনের জলাধার। ছোটগুলো লম্বায় ৬ ফুট, চওড়ায় ৩ ফুট আর গভীরতায় প্রায় আড়াই ফুট। বড়গুলোর গভীরতা একই হলেও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১০ বাই ১০ ফুট। সব মিলিয়ে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১০০০০ ঘনফুট জলাধার তৈরি হয়েছে, যাতে বৃষ্টির জল এদের মাধ্যমে মাটির তলার জলকে সমৃদ্ধ করে। হাতে হাতে ফল পাওয়া গিয়েছে। গত বছরখানেক পঞ্চাশটিরও বেশি শুকিয়ে যাওয়া ঝরনা আবার নতুন জীবন পেয়েছে, পাহাড়ের নিচের দিকে থাকা বেশ কয়েকটি জলাশয়ে আবার সারা বছর জল থেকেছে। গ্রামের লোক প্রথমে হেসেছিল, পাহাড়ের উপর ছোট ছোট ট্রেঞ্চ কাটলে নাকি ঝরনায় আবার জল আসবে। কিন্তু তারাই পরে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে, ম্যাজিকের মতো এখন সারা সময় ধরে জল, পুকুরেও তা-ই। প্রযুক্তির সুবিধে বাঁচিয়ে রাখতে যুক্ত করা হয়েছে সমাজের নিয়মকে। তারা এখন বুঝেছে, জলকে ঠিকভাবে ব্যবহার করা কতটা জরুরি। তাই দক্ষিণ সিকিমের জেলা সদর নামচি থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে পারবিং গ্রামে জল ব্যবহারের জন্য একটা স্থানীয় জল কমিটি গড়া হয়েছে, যারা ঠিক করে কোন পরিবার কীভাবে ক'দিন জল পাবে।

যদিও পাহাড়ি সিকিম ও সমতল ডুয়ার্সের ভূতাত্ত্বিক অবস্থান আলাদা, তবুও ঠিক এখানেই তুলনাটা আসছে আমাদের ‘জল ধরো জল ভরো’ প্রকল্পের সঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং-এই এই প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। উৎসাহিত হয়েছিলেন পরিবেশবিদরা। মনে হয়েছিল, এতদিনে একটা সরকার মাটির তলায় জলসংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ করল, যাতে হেডলাইন পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা সেভাবে সদর্থক রূপ পায়নি প্রকল্প প্রয়োগের উদ্দেশ্যহীনতার কারণে। অথচ সরকারি তথ্যই বলছে যে, সমস্ত রাজ্য জুড়ে মাটির তলার জলস্তর ক্রমশ নামছে।

এক জল বিশেষজ্ঞ আক্ষেপ করে বলেছেন, এমন একটা চমৎকার প্রকল্প মার খাচ্ছে বিজ্ঞানকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে। দরকার ছিল বিজ্ঞানীদের সাহায্য নিয়ে কোথায় কতটা গভীর জলাধার কাটতে হবে তা ঠিক করা, যাতে জমা জল মাটির তলার জলস্তরে পৌঁছাতে পারে। প্রয়োজন ছিল জলাধারে জল ঢোকা ও বেরনোর সুবন্দোবস্ত করা। কিন্তু যখন যেমন টাকা এসেছে, সেই অনুযায়ী কিছু মাটি কাটা ছাড়া বিশেষ কিছু হয়নি। অথচ এই প্রকল্প ঠিকমতো রূপায়ণ করা গেলে সমস্ত গ্রামবাংলা তথা ডুয়ার্সের ছবিটা পালটে দেওয়া যেত। বদলানো যে যায়, তার উদাহরণ সিকিমের পারবিং নামে সেই অখ্যাত গ্রামটি।

(ঋণ— কল্যাণ রুদ্র, দেবেশ রায় এবং থার্ড পোল, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন)

বাগিচা বন্ধ, নদীতীরবর্তী জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে

মে দিবস আসে যায়, শোষণ চলতেই থাকে চা-শ্রমিকের দিন বদলায় না

‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে চায়ের ডুয়ার্সের কোণে কোণে ঘুরে তুলে আনা জ্বলজ্যান্ত ছবি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **পঞ্চদশ পর্বে**।

চায়ের ডুয়ার্স ডুয়ার্সের চা

এই লেখাটি যে দিন প্রকাশিত হবে, তার আগে-পরেই ১ মে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণির কাছে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দিনটিকে তাই শ্রমিকশ্রেণি নিজ নিজ দলীয় ঝান্ডা নিয়ে বুঝে হোক বা না বুঝে, পতাকা উত্তোলন আর দু’-একটা গান বা বক্তব্য-টক্তব্য দিয়ে পালন করে। কোথাও বড় আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়, আবার কোথাও বা দায়সারাভাবে পালন করতে হয়, যেখানে দলীয় সংগঠনের জোর নেই এবং সদস্য সমর্থকরা নেই। তরাই এবং ডুয়ার্সে সিআইটিইউ-এর শক্তিশালী সংগঠনে থাবা বসিয়েছে গজমুমু এবং আদিবাসী বিকাশ পর্যদ, আরএসএস সংগঠন ছড়াচ্ছে চা-বাগিচা বেল্টের মাদারিহাট-বীরপাড়া-জয়গাঁ-কালচিনি-হাসিমারা সার্কলে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ভেঙে গিয়েছে আরএসপি-র দুর্ভেদ্য দুর্গ। আইএনটিইউসি মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি। সিটু অনুমোদিত এবং প্রভাবিত চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন এখনও শক্তিশালী। তবে থাবা বসাচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন শ্রমিকদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য। নতুন করে বাগানে বাগানে ইউনিট খোলার চেষ্টায় সচেষ্ট আইএনটিইউসি নেতা মোহন শর্মা। তার আগে চলুন, আমরা একটু চা-বাগিচা ঘুরে শ্রমিকদের অবস্থা এবং অবস্থানটা আর-একটু পর্যালোচনা করে নিই।

জলপাইগুড়ি সদরের অন্তর্ভুক্ত **রায়পুর চা-বাগান**। দীর্ঘদিন থেকেই সংবাদ শিরোনামে। মন্ত্রীদের আশ্বাস সত্ত্বেও রায়পুর চা-বাগানের ভগ্ন শ্রমিক আবাসের সংস্কার করা হয়নি। তাই বাগানের ৫০০-রও বেশি শ্রমিক বিপদে পড়েছেন। ইন্দিরা আবাসের আওতায় বাগানে কয়েকটি ঘর নির্মিত হলেও শ্রমিক আবাসন সংস্কারে তেমন কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের রায়পুর চা-বাগানের পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান হেমব্রম বিষয়টা নিয়ে বিডিও অফিসে জানিয়েছেন। এদিকে ঘরসংস্কারে সরকার ও বাগান কর্তৃপক্ষ কোনও উদ্যোগ গ্রহণ না করায় প্রবল ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। কথা বললাম রায়পুর চা-বাগানের শ্রমিক সোনিয়ার সঙ্গে।

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে বসবাসের অযোগ্য শ্রমিক আবাসে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন শ্রমিকরা। শ্রমিক নেতা থোংরা রজক জানান, পাঁচশতাধিক শ্রমিক আবাস বসবাসের অযোগ্য, অথচ এই ব্যাপারে প্রশাসন নির্বিকার। পঞ্চায়েত সদস্য প্রধান হেমব্রমের মতে, বাগানে অপুষ্টিজনিত রোগে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মন্ত্রী এবং সরকারি আধিকারিকরা বাগানে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাগানের ভগ্ন শ্রমিক আবাস দ্রুত সংস্কার করা হবে। পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবও এসেছেন রায়পুর বাগানে, দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি। এসেছেন এমপি বিজয়চন্দ্র বর্মণ। মমতার মন্ত্রীসভার প্রথম পর্যায়ের খাদ্য মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটকরা এসে জানিয়েছিলেন, রায়পুর চা-বাগানে শতাধিক ইন্দিরা আবাস নির্মাণ করা হবে। মাত্র অল্প কয়েকটি ঘর নির্মিত হয়েছে বাস্তবে। সেগুলোও নিম্নমানের বলে অভিযোগ করেন শ্রমিকরা। শ্রমিক নেতা এবং পঞ্চায়েত সদস্য উভয়েই জানালেন, বিডিও অফিস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল। পঞ্চায়েত দপ্তরে যোগাযোগ করার পর ত্রিপল পর্যন্ত মেলেনি শ্রমিকদের। রায়পুর চা-বাগানের ম্যানেজার কুন্দন সিং জানান, বাগিচা পরিচালন কর্তৃপক্ষের আর্থিক সামর্থ্য নেই বলেই ভগ্ন শ্রমিক আবাসগুলো সংস্কার করা সম্ভব নয়। চা-বাগান কর্তৃপক্ষ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই শ্রমিক দিবসের কথা বলতেই শ্রমিকদের মুখে বিরক্তির ছাপ।

মানাবাড়ি চা-বাগান। সমস্যায় জর্জরিত চা-বাগানটি রুগ্‌ণ বাগানের তালিকাভুক্ত। অথচ বাগানের বাস্তব চিত্রকে উপেক্ষা করে শ্রমিকদের ১৯ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় ছিলেন বাগানের তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারস ইউনিয়নের তৃণমূল নেতৃত্ব। এ নিয়ে প্রবল বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয় মানাবাড়ি চা-বাগানের সংগঠন দেখভালের দায়িত্বে থাকা তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারস ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পুলিন গোলদারকে। সমালোচনার সম্মুখীনও হতে হয় তাঁকে। মানাবাড়ি চা-বাগানের মালিকপক্ষকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন রাজ্য সরকারের চা সংক্রান্ত ডিরেক্টরেটের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। জলপাইগুড়ির জেলাশাসককে দ্রুত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে মানাবাড়ি চা-বাগানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেও বলে দেওয়া হয়েছিল। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ শ্রমিকদের দুর্দশামোচনে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলা হয়েছিল। একদিকে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিদাওয়া নিয়ে মালিকপক্ষের উদাসীনতা বরদাস্ত না করা, অন্য দিকে দলের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার অপচেষ্টা করছেন যে, সমস্ত শ্রমিক নেতা উভয়কেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সৌরভ চক্রবর্তী। কিন্তু মানাবাড়ি যেমন ছিল, তেমনভাবেই চলছে। ফলে আলাদাভাবে শ্রমিক দিবস তাৎপর্যহীন মানাবাড়ির শ্রমিকদের কাছে।

নয়াসাইলি, কোহিনুর, তোতাপাড়া চা-বাগিচার মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বকেয়া রাখার অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। তিনটে বাগানের নাম শুধু উদাহরণ হিসাবেই রাখা হল। বাস্তবে পিএফ কর্তৃপক্ষের দ্বারা দায়ের করা মামলার সংখ্যা প্রায় ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। ইতিপূর্বে প্রায় দশজন চা-শিল্পপতির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করেছেন পিএফ কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার শতাধিক চা-বাগিচা পরিচালন কর্তৃপক্ষের চা-বাগিচার বকেয়া পিএফ-এর পরিমাণ ৫০ কোটি টাকারও বেশি। বাগিচা পরিচালন কর্তৃপক্ষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্রোক করেও টাকা আদায় করেছে পিএফ কর্তৃপক্ষ। পিএফ কর্তৃপক্ষের চাপে ইতিপূর্বে বানারহাট থানার অধীন তোতাপাড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষ পিএফ খাতে ৪০ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছিলেন। কোহিনুর চা-বাগানের বকেয়া পিএফ-এর পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্রোক করে ২০ লক্ষ টাকা মাত্র আদায় করা হয়েছিল। নয়াসাইলি বাগান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিল ১০ লক্ষ টাকা। পিএফ-এর অর্থ সঠিক সময়ে জমা না দেওয়া ফৌজদারি অপরাধ। কিন্তু তাহলেও শতাধিক চা-বাগান পরিচালন কর্তৃপক্ষ পিএফ-এর টাকা বকেয়া ফেলেছে। তাই প্রশ্ন উঠেছে, শ্রমিক শোষণ প্রতিকারার্থে শ্রমিক সংঘগুলি কী করছে?

বন্ধ চা-বাগানের মাটি বন্ধ্যা নয়। কিন্তু পরিচর্যার উদ্যোগ নেই ঢেকলাপাড়ায়। মালিকপক্ষের প্রতিনিধি নেই রায়পুর চা-বাগানে, সময়ে সময়ে থাকলেও কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। শুখা মরশুমে বাগান পরিচর্যা না করা হলে বর্ষার মরশুমে কাঁচা পাতার ফলন তেমন হবে না। চালু বাগিচার শ্রমিক-কর্মচারীরাও সমস্যার বৃত্তের বাইরে নয়। দাবি আদায়ের জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে চলেছেন প্রায় তিন লক্ষাধিক শ্রমিক। ক্ষুদ্র চা-বাগিচার পরিচালনগোষ্ঠী পাচ্ছে না কাঁচা চা-পাতার প্রত্যাশিত দাম। বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেও বাগিচা শ্রম আইনকে কার্যত মান্যতা দিচ্ছে না বাগিচা মালিকরা। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যমানের নিরিখে মজুরি দেবার ব্যাপারে প্রায় তিন বছর আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে না। দীর্ঘকাল ধরে **ঢেকলাপাড়া চা-বাগান** কোনও সময়ে বন্ধ, কোনও সময়ে রুগ্‌ণ অবস্থায় রয়েছে। বাগানের চা গাছগুলো বয়স্ক হয়ে গিয়েছে। বাগান বন্ধ থাকার ফলে নতুন করে গাছ লাগানো যাচ্ছে না। পুরনো চা গাছ থেকে প্রত্যাশিত কাঁচা চা-পাতা পাওয়া যাচ্ছে না। বাগানের ফ্যাক্টরির যন্ত্রাংশগুলো বিকল। অপারেটিং ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে কাঁচা চা-পাতা তুলে দৈনিক ৩৫ টাকা মজুরিতে কাজ চালাচ্ছে ঢেকলাপাড়া। প্রতি বছর বাগানের কাঁচা চা-পাতার ফলন হ্রাস পাচ্ছে। এইভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সরকারিভাবে বলা হয়েছিল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কাঁচা চা-পাতার প্রক্রিয়াকরণের ইউনিটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু এখনও ঢেকলাপাড়া মানেই একরাশ যন্ত্রণা, বুকভরা কষ্ট এবং শ্রমিকদের জন্য হাহাকার।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, কিন্তু চা-বাগানের শিশুদের শৈশব বিপন্ন। জন্মের পর থেকেই কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে বেড়ে উঠছে তারা। বাবা-মা থাকতেও প্রকৃতির উপর ভরসা করেই বেড়ে উঠছে তারা। **শিশুদের উন্নয়নকল্পে সরকারি অনেক প্রকল্প থাকলেও চা-বাগানের শ্রমিকদের শিশুরা সেই প্রকল্পের সুবিধা থেকে ব্রাত্যই রয়ে গিয়েছে।** প্রকৃতির ভরসায় শিশুদের রেখে মা-বাবারা চলে যাচ্ছেন জীবিকার সন্ধানে। তাদের শিশুরা অযত্নে-অনাদরে পড়ে থাকছে ধুলোবালির মধ্যে। শিশুদের জন্য সরকারি নানা প্রকল্পের সুবিধা এরা পায় না। এভাবেই চা-বাগানের হাজার হাজার শিশু বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে প্রকৃতির ভরসায় শৈশব কাটাচ্ছে। শহুরে মায়েরা কর্মক্ষেত্রে গেলেও তারা তাদের কোলের শিশুকে ক্রেশে রেখে যেতে পারে। কিন্তু চা-বাগানের মহিলা শ্রমিকদের কাছে ক্রেশ কল্পনার বাইরে। শ্রমিক মায়েদেরও মন কাঁদে শিশুদের প্রকৃতির ভরসায় ফেলে রেখে কাজে যেতে। কিন্তু পেট বড় বালাই। কাজে না গেলে খাওয়া জুটবে না। দিনের শেষে এক বেলা তো তারা সন্তানকে কোলে নিয়ে দু'মুঠো খাওয়াতে পারবে। এইটুকু আশা করেই তারা প্রতিদিন কোলের শিশুকে প্রকৃতির ভরসায় ফেলে রেখে কাজে চলে যাচ্ছে। তাই চুয়াপাড়া চা-বাগিচার মংলী ওঁরাও, চ্যাংমারি চা-বাগানের সরিতা হেমব্রম বা লুকসানের জয়ন্তী টিগ্গারা সকলেই একই পরিস্থিতির শিকার। সকলেরই অভিযোগ, তাদের শিশুদেরকে নিয়ে কেউই ভাবে না, এইসব শিশুর পুষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে। এক

মুঠো ভাত ও একটু নুনের প্রত্যাশায় বাড়ির সদস্যদের বাইরে যেতেই হয়। গাছের ছায়াই ওইসব শিশুর কাছে ক্রেশের মতো। সমগ্র উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলোতে গেলেই চোখে পড়বে এই দৃশ্য। চা-বাগানের পাশে সারিবদ্ধভাবে শাড়ি বেঁধে দোলনা তৈরি করে শিশুদের তার মধ্যেই শুইয়ে রেখে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন মহিলা শ্রমিকরা। মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানি গান না শুনলেও পাখির কলকলানি শুনে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে শাড়ির দোলনাকেই তারা মায়ের কোল ভেবে নেয়। বাগানের শিশুসন্তানদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দিয়ে ধুলোবালি ঢুকছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা তো দূরের কথা, তিল তিল করে বেড়ে উঠছে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার কান্ডারিরা।

ফলে শ্রমিক দিবসে শ্রমিকরা, বিশেষত বাগিচা শ্রমিকদের সাম্প্রতিক সংগঠনভিত্তিক হালহকিকত পেশ করার আগে চা-বাগিচার শ্রমিক আন্দোলনের রূপরেখা একটু জেনে নিলে হয়ত এখনকার অবস্থানটা বোঝা কিছুটা সহজ হবে। **জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় শতকরা ৮০ শতাংশ চা শ্রমিকই আদিবাসী।** এরা সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ, হো, খেরিয়া, অসুর, বরাইক, খাসি, মালপাহারি। পাশাপাশি আছে নেপালিরাও। আছে মাহাতো বা ওড়িয়ারাও। তবে সংখ্যায় কম। কিন্তু চা-বাগানের কাজে রাভা, মেচ, গারো এবং টোটোদের দেখাই যায় না। সর্বাধিক শ্রমিক ওরাওঁ উপজাতির। সাধারণ জনগোষ্ঠীর থেকে এই শ্রমিকরা একেবারেই আলাদা। চা-বাগানের মাঝেই এদের বেড়ে ওঠা। জন্ম, কর্ম, বিয়ে, সন্তান প্রতিপালন, নাচ, গান— সবই বাগানের নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। মহিলা শ্রমিকরা সারাজীবনই দিনমজুর। সর্দার, দফাদার, চাপরাশি, খুবসি— এসব পদ মেয়েদের জন্য নয়। চা-বাগিচায় নিয়োগ হয়েছিল পরিবারভিত্তিক। সাপখোপ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের দুর্গম বনমহল কেটে চা-বাগান গড়তে এই ধরনের কুলি তথা শ্রমিকদের আসামে এবং ডুয়ার্সে তুলে আনতে আড়কাঠি লাগানো হয়েছিল। জমিদারি শোষণ, চুয়ার বিদ্রোহ, ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে পিতৃপুরুষের জঙ্গলমহল ছেড়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়ায় এসে মানিয়ে নিচ্ছিল যারা, তাদের স্বর্গসুখের মিথ্যা প্রলোভন দিয়েছিল আড়কাঠিরা। এরা সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর এবং জঙ্গলমহলে ঘুরে ঘুরে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা আদিবাসীদের মধ্যে মিথ্যার জাল বিস্তার করে সপরিবার চা-বাগিচায় নিয়ে এল। সহজ-সরল আদিবাসীরা আড়কাঠিদের কথা শুনে বিশ্বাস করে চা-বাগানে এসে বন্দি ক্রীতদাসে পরিণত হতে লাগল। যাদের একবার নিয়ে আসা হল, তাদের আর ফেরার পথ ছিল না। সহজ-সরল এবং বিভ্রান্ত আদিবাসীরা ভুটান তথা ডুয়ার্সে জোঁকের বীভৎস উপদ্রব, সাপের কামড়, বুনো মোষের গুঁতো, আমাশা, চিতার আক্রমণ, হাতির উপদ্রব, বছরভর বৃষ্টি-হাওয়ায় জেরবার হল। খাঁচায় বন্দি পশুর যে দশা হয়, সেই দশায় জীবন কাটতে লাগল সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁদের। এইভাবেই এল চা-বাগিচায় সোনার ফসল। পাশাপাশি মানসিক, শারীরিক নির্যাতনের সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর পীড়ন এবং আদিবাসী রমণীদের উপর ভোগলালসা চরিতার্থ করার প্রবণতা ক্রমেই বাড়তে লাগল সাহেবদের মধ্যে। কুলি রমণীরা ছিল সাহেব এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের যৌনলিপ্সা মেটানোর শরিক। কুলি তথা মজুরদের এক বাগানের কাজ ছেড়ে অন্য বাগানে কাজে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। বাইরের কোনও কুলি লাইনের লোক অন্য কুলি লাইনে ঢুকতেও পারত না। কুলিদের এক কামরায় খুপরিতে গাদিয়ে রাখা হত। কুলি লাইন পাহারা দিত চৌকিদার। তারা দিনের গুনতির সঙ্গে রাতের গুনতির হিসাব করত। মেয়েদের গুনতি প্রায়ই মিলত না। সাহেব আর আড়কাঠিদের যৌনলালসার বলি হত তারা। গুনতিতে পুরুষ কমে গেলে সাইরেন বাজত। তবুও আদিবাসীদের ঐতিহ্যলালিত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেড়ে নেওয়া যায়নি। আর তা কেড়ে নেওয়া যায়নি বলেই ধীরে ধীরে নিজেদের দাবি আদায়ের প্রতি মরিয়া হয়ে ওঠে আদিবাসী শ্রমিকগোষ্ঠী। সে এক অন্য ইতিহাস।

কাজকাম নেই, ভুখা পেটেই ঘুম

শ্রমিক শোষণের এই প্রেক্ষাপটেই ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে যে লড়াই চা-বাগিচায় বামপন্থীদের মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, আজ সেই লড়াইয়ের উত্তরাধিকারীদের হাত থেকে ধীরে ধীরে ব্যাটন অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের রাজ্য সভাপতি বিরসা তিরকির সঙ্গে বানারহাটে একবার কথোপকথন হয়েছিল। তখন সদ্য প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন জেমস কুজুর। তাতে আশার আলো দেখতে শুরু করেছিল আদিবাসী সম্প্রদায় এবং তাদের নেতৃত্ব অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ। বিরসা তিরকির মতে, বহুদিন থেকেই তাঁরা শুধুমাত্র আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একটি আলাদা দপ্তর গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন। রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই দপ্তরটি ভেঙে ২০১৪ সালে আলাদা আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর গঠন করেন। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দেখাশোনা করলেও পরবর্তীতে সুকুমার হাঁসদা এবং দ্বিতীয় মন্ত্রীসভায় জেমস কুজুরকে এই দপ্তরের মন্ত্রী করেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী তাদের দাবি পূরণ করায় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ খুশি। আর নির্বাচনগুলোতে আদিবাসী বিকাশ পর্ষদ যেহেতু তৃণমূলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই চা-বাগানগুলোতে বাড়ছে ঘাসফুলের দাপট এবং ফ্যাকাশে হচ্ছে লাল ঝান্ডার রং। আর সেই কারণেই পঞ্চায়েত এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে প্রশাসন, অন্য দিকে সংগঠনকে মেলবন্ধন করে ধীরে ধীরে একটার পর একটা নির্বাচনে তিনি বাজিমাত করছেন।

আর সেই কারণেই সংগঠনকে গুছিয়ে নেবার কারণেই চা-বলয়ে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে এক ছাতার তলায় আনার কথা চিন্তা করেছেন দলীয় নেতৃত্ব। চা-বলয়ে কিছুদিন আগেও বিভিন্ন নামে তৃণমূলের একাধিক শ্রমিক সংগঠন ছিল। দলের শীর্ষনেতৃত্বের নির্দেশে এক ছাতার তলায় সব

শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে আসার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, আলিপুরদুয়ারের জেলা পরিষদের সভাধিপতি মোহন শর্মা, কুমারগ্রামের বিধায়ক তথা মন্ত্রী জেমস কুজুর, সাংসদ দশরথ তিরকে প্রমুখকে নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডুয়ার্সের প্রতিটি চা-বাগিচা ঘুরে কোথায় কী সমস্যা আছে তা খুঁজে বার করে আশু সমাধান করা প্রয়োজন। আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার চা-বলয়ে বামেদের দীর্ঘ দিনের শক্ত ঘাঁটিতে তৃণমূলের সংগঠন বেড়েছে। সৌরভবাবু দুই জেলার সভাপতি হবার পর লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে এবং পুরভোটে তৃণমূল উল্লেখযোগ্য ফল করে। তাই দলের সুপ্রিমো মোহন শর্মা এবং সৌরভ চক্রবর্তী— এই দুই বিশ্বস্ত সৈনিকের উপরেই ভরসা রেখে ধীরে ধীরে এগচ্ছেন চা-বলয়ে নিজেদের ভিত মজবুত করার লক্ষ্যে।

বিজেপি-র জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি দীপেন প্রামাণিক এক একান্ত সাক্ষাৎকারে যে আলাপচারিতা করেন, তার নির্যাসটুকু তুলে আনলে লক্ষণীয় বিষয় যেটা তা হল, **ডুয়ার্সের সাতটি অচল চা-বাগানকে কেন্দ্র অধিগ্রহণ করেছে। এটা চা শ্রমিকদের কাছে ইতিবাচক বার্তা। বাকি রুগ্ণ বাগানগুলোতেও অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের দাবিতে বিজেপি সরব হচ্ছে।** শ্রম আইন সংস্কারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। চা শ্রমিকরা যাতে ন্যূনতম মজুরি পান, সেই দাবিও থাকছে। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট, কালচিনি এবং কুমারগ্রামে বিজেপি তাদের সংগঠন অনেকটা বাড়িয়েছে। বিধানসভা ভোটে মাদারিহাট বিজেপি-র দখলে। কালচিনিতে দ্বিতীয় এবং কুমারগ্রামে তৃতীয়। তাই রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আগামী দিনে চা-বলয়ে তৃণমূলের মূল লড়াই হবে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার সহযোগী দলগুলোর সঙ্গে। ফলে শ্রমিক সংগঠনে পালাবদলের প্রশ্নে আশাবাদী দীপেন প্রামাণিকরাও।

পূর্বতন বাম-সরকারের আমলে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণমন্ত্রক নামে দপ্তর থাকলেও রীতিমতো পরিকল্পনা করেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেমস কুজুরকে দলের প্রার্থী করেছেন। প্রশাসনিক আধিকারিকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জেমস কুজুর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হবার ফলে সেই সময়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক সৃষ্টি হলেও যথেষ্ট চিন্তাভাবনার ফসল এই সিদ্ধান্ত। সরাসরি প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে মন্ত্রী হয়েছেন ডুয়ার্সের ভূমিপুত্র জেমস কুজুর। কর্মসূত্রে খুব কাছ থেকে তরাই ও ডুয়ার্সসহ গোটা রাজ্যের আদিবাসী সম্প্রদায়ের নানা সমস্যা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। ফলে কর্মজীবনের এই বিপুল অভিজ্ঞতা আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের পরিচালনায় ইতিবাচক সাড়া ফেলবে বলেই ধারণা করা যায়। কারণ রাজ্যের আদিবাসী বা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়নের জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নানা প্রকার উন্নয়নমূলক প্রকল্প নেওয়া হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার সঠিক বাস্তবায়ন হয় না। তাই দীর্ঘ সময় ধরে চা-বাগানসহ রাজ্যে আদিবাসীদের নানা প্রকল্পগুলো গতিহীনতায় ভুগেছে। এর ফল ভোগ করতে হয়েছে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির মানুষকে। দীর্ঘ সময় ধরেই রাজ্যে মন্ত্রীসভার বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রীদের কাজকর্মের উপর প্রশাসনিক আধিকারিক বা আমলাদের ছড়ি ঘোরানোর প্রবণতা আছে। কিন্তু **জেমস কুজুর শুধু মন্ত্রী নন, দক্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকও। তাই তরাই-ডুয়ার্সের চা-বাগিচা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত হবে বলে আশা করা যেতেই পারে।**

সমর গুপ্তর দেওয়াল লিখনের ভাষা যে কতটা যথার্থ ছিল তা জলপাইগুড়ির বর্তমান মন্দা অর্থনীতির পরিস্থিতি দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। খেলোয়াড় জীবনে রক্ষণভাগে খেলতেন। কর্মজীবনে দূরভাষ বিভাগের কর্মী ছিলেন। কলকাতার প্রথম বিভাগীয় ফুটবল লিগে জর্জ টেলিগ্রাফ দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কর্মক্ষেত্রে অবসরগ্রহণের পর বসে থাকেননি। জলপাইগুড়ির সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে জলপাইগুড়ি অবক্ষয় প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটি গড়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জলপাইগুড়ি শহরের কর্মব্যস্ত এলাকার বিভিন্ন ভবনের দেওয়ালে দেওয়ালে জলপাইগুড়ি থেকে বিভিন্ন চা-বাগানের হেড অফিস স্থানান্তরের প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করার পোস্টার নয়ের দশকে যেমন চোখে পড়ত, তেমনই একই দাবিতে দেওয়াল লিখন হত। প্রকৃত অর্থে, রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদক জেলা হলেও জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে চা সরবরাহ হয় না। জেলার ১৫৬টি বৃহৎ চা-বাগিচার মধ্যে ৬২টি বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায় চলে গিয়েছে। ফলে অবশিষ্ট ৯৪টি চা-বাগিচার হেড অফিসগুলোও বর্তমানে শহরে নেই, চলে গিয়েছে কলকাতায়। অবিভক্ত জেলার ১৫৬টি বৃহৎ বাগানের মধ্যে ১৩৪টির হেড অফিসই ছিল জলপাইগুড়ি শহরে। ফলে ধীরে ধীরে ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছে চা-শিল্পভিত্তিক জলপাইগুড়ি শহরের উন্নয়ন। শহরের শিবাজি রোডে ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টারস অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর ভবনে ২০০৫ সালে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র স্থাপিত হয়। রাজ্যের তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী নিরুপম সেনের উদ্‌বোধন করা এই চা নিলামকেন্দ্রকে ঘিরে জলপাইগুড়ির অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে— এইরূপ একটি ধারণা করা গিয়েছিল। ছ'টি গুদাম রয়েছে জলপাইগুড়িতে, যেগুলো ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু নিলামকেন্দ্র চালু হওয়ার পর চা-শিল্পে কখনওই গতি আসেনি। হাতে গোনা কয়েকটি বাগান জলপাইগুড়ির নিলামকেন্দ্রে চা পাঠিয়েছে। অথচ **রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদক জেলা জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি জেলাতে বেসরকারি হিসাবে ১৫০০০টি ছোট চা-বাগান আছে। অথচ জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে নিলাম বন্ধ চায়ের সরবরাহের অভাবে।** ফলে শহরের গুদামগুলোর ঝাঁপও বন্ধ। ২০০৫ সালে নিলামকেন্দ্র চালু হবার সময়ে এই কেন্দ্রে নিলামের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজ্যের তৎকালীন অর্থ মন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। কিন্তু প্রতিশ্রুতি আজও কার্যকর হয়নি। হেড অফিসগুলো যখন বেশি সংখ্যায় জলপাইগুড়িতে ছিল, তখন জলপাইগুড়িতে বাজার থেকে চা প্যাকিং করার যন্ত্র, পরবর্তীতে চায়ের ব্যাগ, ছাতা, জুতোসহ বিভিন্ন সামগ্রী কেনা হত। চায়ের ব্যাগ তৈরির বেশ কয়েকটি কারখানা হয়েছিল শহরে। এখন সেগুলোও বন্ধ।

তাই বলা যায়, মে দিবস যাবে-আসবে। কিন্তু হয়ত বা আর ফিরবে না চা-বাগিচাগুলোর সেই রমরমা। ফিরবে না হয়ত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা। **বাৎসরিক প্রায় ৫ কোটি টাকা লোকসানের বোঝা নিয়ে চলছে ওয়েস্ট বেঙ্গল টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। কর্পোরেশনের অধীনে রয়েছে পাহাড় ও ডুয়ার্সের পাঁচটি বাগান।** অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চায়ের বাজার তেজি। তেজি বাজারের সুবাদে রুগ্ণ অনেক বেসরকারি চা-বাগান ঘুরে দাঁড়ালেও সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন বাগানগুলো ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা বেতনে কারিগরি পরামর্শদাতা বা টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসর নিয়োগ করলেও সরকার পরিচালনাধীন বাগানগুলোর উৎপাদনের লেখচিত্র নিম্নগামী। **বিগত পাঁচ বছরে সরকারি বাগানে একটিও পাকা শ্রমিক আবাস নির্মিত হয়নি। বর্ধিত মজুরির বকেয়া শ্রমিকরা পাননি সরকারি বাগিচায়।** সাব-স্টাফদের অবস্থা তথৈবচ। সরকার প্রবর্তিত বাগিচা শ্রম আইন অনুসারে যদি সরকারি চা-বাগিচার শ্রমিকরাই মজুরি না পান তাহলে শ্রমিক দিবসের প্রেক্ষাপটে জবাবদিহি করার দায় কার?

রাজবাড়ির টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসছে কাঁচা মল, দর্শকের নাকে রুমাল

কোচবিহার
কালিম্পং

চরম অবহেলায় দিন কাটছে কোচবিহার রাজপ্রাসাদের। বর্তমানে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রাসাদটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকলেও অভিযোগ, পুরাতত্ত্ব সংরক্ষণের নামে এখানে যা চলছে, তাকে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এ বিষয় নিয়ে এই পত্রিকায় গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। অবস্থার উন্নতিকল্পে যাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা সেই দায়িত্বপালন দূর অস্ত, একটা দিন খোঁজও নিতে আসেননি। তারপর কেটে গিয়েছে আট মাস। অথচ প্রাসাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক, দিন দিন এর অবনতি হচ্ছে বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে উঠে এল আরও নতুন কিছু অবাক করা তথ্য।

কুড়িটি সিসিটিভি লাগানো রয়েছে রাজপ্রাসাদে। শেষ যে কবে সিসিটিভি কাজ করেছিল তা মনে করে বলতে গেলে কর্মীদেরও ভাবতে হয়। প্রতিবেদন প্রকাশ হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত চালু হয়নি সিসিটিভি। সুতরাং প্রাসাদের নিরাপত্তার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আর ইন্টারকমের কথা তো ছেড়েই দিলাম। জানা গেল, মিউজিয়ামের ঘরগুলোতে সিকিয়োরিটির জন্য সেন্সর সিস্টেম ছিল। ঘরের দরজা বন্ধ হবার পর কোনওরকম অস্বাভাবিকত্ব হলেই বেজে উঠত হুটার। কিন্তু সেসব আজ অতীত। সেন্সর সিস্টেম মেরামত না করায়, এখন কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটলে তা কারও পক্ষেই সেই মুহূর্তে জানা সম্ভব নয়।

কর্মীদের মধ্যে বেশির ভাগ ক্যাজুয়াল কর্মী। তাঁরা আবার নিয়মিত বেতনও পান না। কেউ কেউ ফেব্রুয়ারি মাসের পুরো বেতন আজ পর্যন্তও নাকি পাননি।

আজও খোলেনি অস্ত্রাগার ও কয়েন গ্যালারি। নতুন করে যে ঘরগুলোতে দেওয়ালে নকশা, রং করানো হয়েছে, সেগুলো সেই সময় থেকে এখনও বন্ধই রয়েছে। অভিযোগ, ঘরগুলোর চাবি যাঁর দায়িত্বে রয়েছে, তিনি নাকি ঘর খোলেন না। আলো-বাতাস না পেয়ে ঘরগুলো আবার নোনা ধরে গিয়েছে। একতলার টয়লেটের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতি হচ্ছে বিলিয়ার্ড রুম ও অ্যানথ্রোপলজিক্যাল গ্যালারির। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আশ্চর্যভাবে নীরব।

জানা গেল, প্রাসাদের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন, সেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট পিকে নায়েক কোচবিহারে বলতে গেলে আসেনই না। তিনি সব ভার একজন এলডিসি-র হাতে দিয়ে কলকাতাতেই থাকেন। এত বড় দায়িত্ব একজন এলডিসি-র কাছে কী করে থাকে তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে। প্রাসাদের দরবার হলের গম্বুজের চারদিকে চারটি ঝাড়বাতি রয়েছে। তার প্রত্যেকটিতে রয়েছে ৫০টি করে বাল্ব। অথচ সেই আলো আর জ্বলে না। সারাইয়ের কোনও উদ্যোগ নেই। ঐতিহ্যবাহী এই প্রাসাদ দেখতে আসা পর্যটকরা আলো ঝলমল গম্বুজের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অভিযোগ, মাসের পর মাস এই নষ্ট হয়ে পড়ে থাকা আলোর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি মাসে বিলও দেখানো হচ্ছে।

চোখে পড়ল আরও একটি অবাক করা দৃশ্য। নাকে রুমাল দিয়ে হাঁটছেন পর্যটকরা। কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়ে যা চোখে পড়ল, তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রাসাদের উত্তর দিকের দেওয়াল ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসছে টয়লেটের মল। তার দুর্গন্ধ থেকে নিজেদের বাঁচাতেই বাধ্য হয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আসতে হচ্ছে পর্যটকদের। এ বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে এর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার পঙ্কজ দাস জানান, তিনি এই ঘটনার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। এ বছর যদি ফান্ড আসে, তবে গ্যালারি, বাথরুম সব ঠিকঠাক করার অর্ডার এসেছে। এ ছাড়া বাইরে একটি টয়লেট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি কোম্পানিকে তার বরাতও দেওয়া হয়েছে। ওটা তৈরি হয়ে গেলে তখন ভিতরের টয়লেট বন্ধ করে দেওয়া হবে।

যে খবরে ক্ষুব্ধ কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়

১৯ বছর কাজ করার পর রাজবাড়ির একজন ক্যাজুয়াল শ্রমিককে বিনা নোটিশে বসিয়ে দেওয়া নিয়ে নতুন করে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর, মিনিস্ট্রি অব কালচারের সেক্রেটারি নবনীত সোনি রাজবাড়ির দায়িত্বে থাকা সুপারিন্টেন্ডিং আর্কিয়োলজিস্ট গৌতম হালদারকে ফোন করে তরুণ মজুমদার নামে ওই কর্মীকে কোনও কারণ ছাড়াই বসিয়ে দিতে বলেন। সেই ফোনের আদেশ তামিল করে কলকাতা থেকে চিঠি করে ওই কর্মীকে বসানোর নির্দেশ আসে। যদিও এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এসবের কোনও সদুত্তর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দিতে পারেননি।

এ ধরনের ভুরি ভুরি অভিযোগ রয়েছে প্রাসাদকে ঘিরে। তবে একটা জিনিস কিছুটা হলেও বন্ধ হয়েছে, তা হল রাজপ্রাসাদের সিংহদুয়ার যখন ইচ্ছা খোলা। রাজপ্রাসাদের

প্রতি এত অবহেলা অথচ এর জন্য প্রতিদিন যে হারে দর্শক আসেন এবং তার জন্য সরকারের যা আয় হয় তা শুনলে আশ্চর্য হতে হয় বইকি। সাধারণ দিনে গড়ে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা আসে টিকিট বিক্রি থেকে। উৎসবের দিনে তা গড়ে ৩০/৪০ হাজার হয়। জানা গেল, এ বছর সরস্বতী পুজোর দিন টিকিট বিক্রি হয়েছে ১ লাখ ৪৮ হাজার টাকার। দুঃখের বিষয়, তা সত্ত্বেও আসে না ঠিকা কর্মীদের মাইনে।

রাজপ্রাসাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল জানতে চাওয়া হলে কোচবিহারের সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় জানান, রাজপ্রাসাদ নিয়ে লোকসভার পরবর্তী সেশনে তিনি কথা বলবেন। প্রাসাদের প্রতি এই অবহেলা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে একটা ক্ষোভ দানা বাঁধছে। এটা ঠিক নয়। কোচবিহারের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানের রাজপ্রাসাদ নিয়ে এই অবহেলা খুবই দুঃখজনক। তিনি বলেন, 'আমি সংসদে এ বিষয়টি তুলব। আমি চাই এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন দপ্তর আরও বেশি অর্থ বরাদ্দ করুক, যাতে সব ক'টা ঘর সংস্কার করা যায়, সব ক'টা ঘর নিয়েই মিউজিয়াম করা যায়, আর তা মানুষের জন্য খুলে দেওয়া যায়। এতে মানুষ আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন এইসব পুরাতত্ত্বের প্রতি। এই জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে। তার জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান করে রাজবাড়ি ঢেলে সাজাতে হবে। কিছু জায়গার ছাদের রেলিং ভেঙে পড়ছে, পলেস্তারা খসে পড়ছে। জায়গায় জায়গায় শেওলা ধরে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে রাজপ্রাসাদ তার গৌরব হারাবে। এ ছাড়াও রাজবাড়ি নিয়ে আরও বেশ কিছু অব্যবস্থার কথা আমার কানে এসেছে। সব কিছু নিয়েই সংসদে সরব হব। তবে শুধু রাজবাড়ি নয়, পাওয়ার হাউস-সহ পুরনো যত বিল্ডিং রয়েছে, সেগুলোকেও হেরিটেজের আওতায় আনতে হবে। কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর হিসাবে ঘোষণা করার দাবিও রাখব এইবারের অধিবেশনে।'

১৮ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ডে। এবারের দিনটিও কোচবিহার রাজপ্রাসাদে ঘটা করে পালন করা হবে প্রতিবারের মতো। একটা দিনের জন্য কলকাতা থেকে এএসআই-এর লোকজন আসবেন হয়ত। কিন্তু তাতে প্রাসাদের এই বিশৃঙ্খলার কি কোনও পরিবর্তন আদৌ হবে? উত্তর অজানা। এবার কোচবিহারের গৌরব, রাজপ্রাসাদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য কোচবিহারবাসী সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়ের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

লাটাগুড়ি কার্নিভাল

মুম্বইয়ে কার্নিভাল হয়, গোয়ায় কার্নিভাল হয়, কলকাতায় কার্নিভাল হয়, দার্জিলিঙেও কার্নিভাল হয়, তাহলে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে অনাবিল সৌন্দর্যের লীলাভূমি ডুয়ার্সের বুকে কার্নিভাল হবে না কেন? আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা লাটাগুড়ি কার্নিভাল কমিটির চেয়ারম্যান ৮ এপ্রিল লাটাগুড়ি কার্নিভ্যালের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে উল্লিখিত মন্তব্য করে গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের কোলে লালিত জনপদ লাটাগুড়িতে কার্নিভাল করার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। লাটাগুড়ি কার্নিভাল মানে লাটাগুড়িসহ গোটা ডুয়ার্সের প্রকৃতি পর্যটনের বিপুল সমারোহ বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা। লাটাগুড়ি কার্নিভাল মানে ডুয়ার্সের প্রকৃতি আর লোকসংস্কৃতিকে নিয়ে নাচে-গানে, আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠা। সাংসদ সুব্রত বক্সীর মানসপ্রসূত এবং ডঃ সৌরভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৮ থেকে ১০ এপ্রিল লাটাগুড়ি ফুটবল ময়দানে আয়োজিত যে ঐতিহাসিক ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী লাটাগুড়ি কার্নিভ্যালের আয়োজন করা হয়েছিল, তার যুগান্তকারী সাফল্যবার্তা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম মারফত ডুয়ার্সের প্রান্তভূমি থেকে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে রাজ্য ও দেশের সর্বত্র।

৮ এপ্রিল লাটাগুড়ির ক্রান্তি রোড থেকে লাটাগুড়ি ফুটবল মাঠের কার্নিভাল প্রাঙ্গণ পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাটাগুড়িসহ পশ্চিম ডুয়ার্সে আগত পর্যটকসহ ৮ থেকে ৮০ বছর পর্যন্ত অগণিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যে পর্যটনকে নিয়ে যে মাতামাতি লক্ষ করা যায় তা ছিল লাটাগুড়ি কার্নিভ্যালের প্রাথমিক সাফল্য। এ দিনের সুসজ্জিত ট্যাবলো পরিবেশিত বর্ণ বৈচিত্রময় শোভাযাত্রা উৎসব প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছানোর পর বিকাল ৪টেয় মূল মঞ্চে তিন দিনব্যাপী ঐতিহাসিক লাটাগুড়ি কার্নিভ্যালের জনক সুব্রত বক্সী প্রদীপ প্রজ্বলন করে কার্নিভ্যালের শুভ উদ্‌বোধন করেন। মঞ্চে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জেমস কুজুর, জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মণ, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি নুরজাহান বেগম, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক ও কার্নিভাল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ সৌরভ চক্রবর্তী। ছিলেন ফালাকাটা, ময়নাগুড়ি, মাল, রাজগঞ্জের বিধায়কগণ, যথাক্রমে— অনিল অধিকারী, অনন্তদেব অধিকারী, বুলু চিকবরাইক, খগেশ্বর রায়, জলপাইগুড়ি বন্য প্রাণী শাখার ডিএফও নিশা গোস্বামী, অ্যাডিশনাল এসপি নিমু নরবু ভুটিয়া প্রমুখ। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের পরই শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্‌বোধনী সংগীত পরিবেশন করে মানসী কর ও সম্প্রদায়। শুরুতেই জলপাইগুড়ি চাউনহাটি থেকে

আগত বেবী রায় বর্মণ ও সম্প্রদায় পরিবেশিত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের বিলুপ্তপ্রায় 'বৈরাতি নৃত্য-গীত' দর্শকদের মনে আনন্দের জোয়ার আনে। তারপর কলকাতার স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সাহানা বক্সী ও সৌমী ভট্টাচার্য পরিবেশিত রবীন্দ্রসংগীত হাজার হাজার শ্রোতাকে সুরের জগতে নিয়ে যায়। সংগীতশিল্পী সৈকত মিত্র পরিবেশিত সংগীতও শ্রোতাদের মন জয় করে। সব শেষে ভারতখ্যাত সংগীতশিল্পী অনীক ধর পরিবেশিত সংগীত শ্রোতৃমণ্ডলী সহ লাটাগুড়ির আকাশ-বাতাসকে আনন্দমুখরিত করে তোলে।

৯ এপ্রিল ছিল কার্নিভ্যালের দ্বিতীয় দিন। এ দিন সন্ধ্যায় শুরুতেই লাটাগুড়ি থেকে প্রকাশিত সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন বিষয়ক পত্রিকা 'অধিযুগ'-এর নবপর্যায়ের দ্বিতীয় সংখ্যার শুভ উদ্‌বোধন করেন ডঃ সৌরভ চক্রবর্তী। পাশাপাশি এই মঞ্চে একই সঙ্গে আয়োজন করা হয় প্রকৃতি পর্যটন বিষয়ক একটি আলোচনাচক্রের। এই অনুষ্ঠানে ডঃ সৌরভ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালের বিধায়ক বুলু চিকবরাইক, নাগরাকাটার বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি নুরজাহান বেগম, এতোয়ার সভাপতি পর্যটন বিশেষজ্ঞ সম্রাট সান্যাল, দুলাল দেবনাথ, প্রণব চক্রবর্তী, তপনকুমার রায়-সহ 'অধিযুগ' পত্রিকার পরিচালন সমিতির সকল সদস্য ও পুণ্যপ্রভা বর্মণ-সহ জলপাইগুড়ির সাহিত্যপ্রেমীগণ। 'অধিযুগ' পত্রিকার উদ্‌বোধক ডঃ সৌরভ চক্রবর্তী তাঁর উদ্‌বোধনী ভাষণে প্রকৃতি পর্যটনের বিষয়ে আলোচনা করেন, এবং লাটাগুড়ি কার্নিভ্যালের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করে পশ্চিম ডুয়ার্সের মাল ব্লকের লাটাগুড়িসহ বিভিন্ন স্থানে পর্যটনের স্বার্থে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নানাবিধ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ ছাড়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মালের বিধায়ক বুলু চিকবরাইক, নাগরাকাটার বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, এতোয়ার সভাপতি সম্রাট সান্যাল এবং লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রণব চক্রবর্তী। এ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিবেশিত হয় অমূল্য দেবনাথ পরিচালিত কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজের বিলুপ্তপ্রায় 'চণ্ডীনৃত্য'। বিবেক প্রধানী পরিচালিত আসামের বিহু নাচ দর্শকদের মুগ্ধ করে। এর পরে আসর মাতিয়ে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি ও লোকগান পরিবেশন করেন সৈয়দ নজরুল হক পরিবেশিত লোকশিল্পী কল্যাণ সমিতি 'শিকড়'-এর শিল্পীবৃন্দ। সংগীতশিল্পী শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী ও দেবশ্রী কুণ্ডু পরিবেশিত সংগীত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে। সব শেষে গানের ডালি নিয়ে শ্রোতাদের মন জয় করেন কৌশিক গোস্বামী। লাটাগুড়ি কার্নিভ্যালের দ্বিতীয় দিনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ভারতখ্যাত সঞ্চালক সাকিল আনসারী। তাঁর সাবলীল সঞ্চালনা সব কিছুকে ছাপিয়ে হাজার হাজার শ্রোতার মন ভরিয়ে তোলে।

উৎসব প্রাঙ্গণে বিগত দুই দিনে অপ্রত্যাশিত জনসমাগমের নিরিখে তৃতীয় তথা শেষ দিনের কথা ভেবে কার্নিভাল কমিটির কর্মকর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দেয়। এ দিন পুলিশ প্রশাসনও ছিল আঁটসাঁট। নিরাপত্তার বিন্দুমাত্র খামতি ছিল না। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকসহ হাজার হাজার মানুষ এ দিন সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই কার্নিভাল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হন। পশ্চিম ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তে এবং অবশ্যই লাটাগুড়িতে বেড়াতে আসা পর্যটকরা বিগত দু'দিনের মতোই শেষ দিনের এই উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলমান আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। এ দিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই যাঁদের অবদান, সমাজসেবা ও ত্যাগের কথা তেমনভাবে প্রচারের আলো স্পর্শ করেনি, যাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন—

এরকম সাতজন বিশিষ্ট গুণীজনকে নানা ক্ষেত্রে তাঁদের সামাজিক, সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের জন্য লাটাগুড়ি কার্নিভাল কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রথমেই কার্শিয়াঙের তুষার সিংহর নৃত্য দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাশাপাশি লুকসানের বাবুলাল সুব্বা পরিচালিত নেপালি নৃত্য-গীত এবং তারপরে মালবাজারের অজয় থাপা পরিবেশিত সংগীত শ্রোতাদের মন জয় করে। এর পর স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের হাস্যকৌতুক নৃত্য-গীত 'খ্যামটা' পরিবেশন করে যোগেন রায় ও সম্প্রদায়। নীলকমল বারইয়ের বাউল সংগীতসহ তাঁর সহযোগী শিল্পী হরনা রায়, রিয়া দত্ত, জয়শ্রী বর্মন ও উৎপলা রায় ভাওয়াইয়া সংগীত পরিবেশন করেন। লাটাগুড়ি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় একটি অসাধারণ গীতি আলেখ্য। এ দিনের অনুষ্ঠানে লাটাগুড়ি কার্নিভাল কমিটির পক্ষে সুজয় দেব পরিচালিত ও দিব্যেন্দু দেব রচিত পর্যটন, পরিবেশ ও স্থানীয় লোকাচার বিষয়ক একটি নৃত্যালেখ্য কার্নিভ্যালের উদ্দেশ্যকে লাটাগুড়ির আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। নৃত্য পরিবেশন করে শিলিগুড়ির শিশুশিল্পী ঈশানী চ্যাটার্জি। সব শেষে মুম্বইয়ের বিখ্যাত শিল্পী জলি মুখার্জি ও তাঁর সহযোগী শিল্পী অনুরাধা ঘোষের সাবলীল সংগীতের সুরমূর্ছনায় লাটাগুড়িসহ সমগ্র ডুয়ার্সে লাটাগুড়ি কার্নিভ্যালের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ঘোষিত হয়। তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানকে মনোগ্রাহী করে তোলেন সঞ্চালক সুধাংশু বিশ্বাস ও রেমা গাঙ্গুলি। ডঃ সৌরভ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আয়োজিত এই বর্ণময় ঐতিহাসিক কার্নিভালকে সব দিক থেকে সুন্দর, সর্বাঙ্গীণ ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার কাজে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও, কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে সত্যের অপলাপ হবে। তাঁরা হলেন— অর্ঘ্য প্রসূন রায়, মহুয়া গোপ, সঞ্জয় মুখার্জি, শান্তনু কর, রাকেশ লস্কর, দিব্যেন্দু দেব, জগবন্ধু সেন, মিন্টু পাল, দেবাশিস হোড়, কৌশিক ভৌমিক, প্রতাপ তামাং, দ্বিজেন রায়, মিঠুন কর, মানবেন্দ্র রায়, মজিদুল ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ্য, সরকারি-বেসরকারি মিলে উৎসব প্রাঙ্গণে ৪০টি প্রদর্শনী স্টল স্থাপিত হয়। এই স্টলগুলোতে, বিশেষ করে খাওয়ার স্টলগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল দেখার মতো।

পরাণ গোপ

হুল ফোটালেও পাহাড়ে দাঁত বসাতে পারবে তৃণমূল?

বিভাজনের সুচতুর চালে পাহাড়ে আপাতত ব্যাকফুটে খেলছেন গুরুংবাহিনীর গোজমুমো, কিন্তু এতে আখেরে নিজেদের কতটা লাভ হবে বাংলার শাসকদলের? এই প্রশ্নটা এখন ঘুরে-ফিরে ধাক্কা খাচ্ছে পাহাড়ের নানা কোণে, ফিরে আসছে সমতলে। আসন্ন পুর ও জিটিএ নির্বাচনের আগে ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহল। 'দার্জিলিং ছেড়েই দাও, কার্শিয়াং-মিরিকে কিঞ্চিৎ ঢেউ হয়ত উঠতে পারে, কিন্তু কালিংপঙে সম্ভাবনা থাকলেও হরকা বাহাদুরের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় সেই সুযোগ মাঠে মারা যেতে বসেছে।' সম্প্রতি এই মন্তব্য করলেন উত্তরবঙ্গের প্রথম সারির এক তৃণমূল নেতা। তাঁর খোলাখুলি ব্যাখ্যা, 'পর্যবেক্ষক হিসেবে যাঁদের পাহাড়ে পাঠানো হয়েছে, এক মোহন শর্মা ছাড়া আর কেউ না বোঝেন পাহাড়ি ভাষা, না অভ্যস্ত পাহাড়িদের আচরণে। গৌতম দেব এর আগেও পাহাড়ে ব্যর্থ হয়েছেন সংগঠন তৈরি করতে। সমতলের এইসব নেতার সঙ্গে পাহাড়ি নেতা-কর্মীদের বিশ্বাসের জায়গাটাই এত কম সময়ে তৈরি হতে পারে না। পাহাড়ি নেতারা যাঁরা শিবির পালটে এসেছেন পদের লোভে বা কিছু পাওয়ার আশায় তাঁরা এখনও এক অদৃশ্য দূরত্ব বজায় রেখে চলছেন সমতলের নেতাদের সঙ্গে।' শিলিগুড়ির এক উঠতি নেতা তো বলেই দিলেন, নেতৃত্বের নির্দেশে সবাইকে কাজ করতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ভাবুন, সারাদিন পাহাড়ে ঘুরে, মিছিল-বক্তৃতা করে সন্ধেয় শিলিগুড়ি নেমে এলাম, এভাবে কি হয়? এভাবে আর যা-ই হোক, পাহাড়ে দলের সংগঠন দৃঢ় হতে পারে না।

আর তার উপরে আছে গুরুংবাহিনীর সরাসরি টাকা ছড়ানোর রাজনীতি, টাকার বিনিময়ে ভোট দাও। অভিযোগ জানালেন সেই নেতা। ধরেই নেওয়া যায়, তৃণমূলকে ঠেকাতে সেই টাকার জোগান দিচ্ছে বিজেপি! বিজেপি নেতাদের সে অভিযোগ সহাস্যে উড়িয়ে দেওয়া মন্তব্য, তৃণমূল নেতারা ভাবেন সবাই তাঁদের মতোই। আসলে সমস্যাটা অন্য জায়গায়। পাহাড়ে আগাগোড়াই লক্ষ করে থাকবেন, সমতলের তাবড় দলগুলি কখনওই সাংগঠনিক ভিত্তি পাহাড়ে গড়তে পারেনি, কারণ সাংস্কৃতিক পার্থক্য। দীর্ঘ বঞ্চনার পর পাহাড়ের মানুষ সমতলিদের আর যা-ই হোক, বন্ধু ভাবে না। সে জন্যই বিজেপি সরাসরি প্রার্থী দেওয়ার চাইতে পাহাড়ি দলকে সমর্থন করে, কারণ তাদের যুক্তি, আর যা-ই হোক, গুরুংরা তো আর দেশবিরোধী কাজকর্ম করেন না।

কাজেই অশান্তির রাজনীতি থেকে বিরত থাকলেও আমরা গোর্খাল্যান্ডের দাবি থেকে সরে এসেছি— এ কথা ভাবাটাই ভুল। আর তাই আপনাদের হিসেব কখনওই মিলবে না, পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছেন জনমুক্তি মোর্চার নেতারা, কারণ সেই দাবি থেকে বিচ্যুতি মানে পাহাড়িদের মন থেকে চ্যুত হওয়া। তাঁদের বক্তব্য স্পষ্ট, কিছু পাওয়ার লোভে শহরের মানুষদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে তাড়াতাড়ি। তাই শহরের কিছু মানুষকে তৃণমূলকে সমর্থন করতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তারাও শীঘ্রই আবার ফিরে আসবে। মোর্চার অখণ্ড সংগঠনে ফাটল ধরিয়ে পাহাড়ে তৃণমূলের আবির্ভাব গুরুঙের কপালে ভাঁজ ফেলেছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের মধ্যে এখনও যে 'জোশ' টিকে আছে, কংগ্রেস বা সিপিএমের মতো 'ঐরাবতী' সংগঠনে দলের এখনকার হাল ফেরাতে তা অনুকরণীয় তো বটেই, উলটে তা তৃণমূলিদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাতে সক্ষম।

নিজস্ব প্রতিনিধি

উত্তরের ‘রয়্যাল’ বেঙ্গল সাফারি মুক্ত চিড়িয়াখানা শিলিগুড়ির গর্ব

উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে আর সব মেলে, কিন্তু ব্যাঘ্রের দেখা মেলা নাকি ঈশ্বরদর্শনের চাইতেও কঠিন। এহেন প্রবাদবাক্যকে পুরোপুরি অসত্য প্রমাণ করতে মামাজিরা অবশ্য কখনও সখনও ঝলক-সাক্ষাৎ দেন ঠিকই, কিন্তু এতে যে বদনাম ঘোচে না। এর আগে দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে সার্কাস থেকে রিটায়ার্ড বাঘেদের এনে রেখে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু আইনি প্যাঁচে এবং তাদের ক্রমপঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে সে প্রচেষ্টা লাটে উঠল। অতঃপর তরাই জঙ্গল-ঘেঁষা নয়া বেঙ্গল সাফারি পার্কে নামের আগে সম্প্রতি রয়্যাল যোগ করা হয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তা পর্যটনে নতুন পালক আশা করা যায়।

শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। প্রচণ্ড গরমে মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে পড়ছেন, তখন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল বা ডুয়ার্সের জঙ্গলে চলে যান একটু সবুজের বুকে জিরিয়ে নিতে। তা ছাড়া পাহাড় তো আছেই। কিন্তু দার্জিলিং, সিকিম বা ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে শিলিগুড়িতে থাকার সময় অনেকেই শিলিগুড়িতে কী দেখবেন ভেবে পেতেন না। শিলিগুড়িতে একটা দিন কাটানোর সময় কোথায় থাকবেন, কী করবেন, সেই ভাবনার দিন শেষ। শিলিগুড়ির পাশেই সেবকের দিকে যেতে শালুগাড়া অতিক্রম করলেই জাতীয় সড়কের ধারেই তৈরি হয়েছে বেঙ্গল সাফারি। সেই সাফারিই এখন উত্তরবঙ্গ তো বটেই, গোটা বাংলা, গোটা দেশ, এমনকি বিদেশিদের প্রশংসাও কুড়িয়ে চলেছে।

২০১৬ সালের ২২ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই চালু হয় এই বেঙ্গল সাফারি পার্ক। বর্তমান পর্যটন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব এই সাফারি পার্ক তৈরি করবার জন্য ব্যাপক পরিশ্রম করেন। এখনও তিনি পরিশ্রম করে চলেছেন। মোট ২৯৭ হেক্টর এলাকা নিয়ে চালু হয় মূল প্রকল্পের বেঙ্গল সাফারি পার্ক। এর মধ্যে এখন দুটো সাফারির ব্যবস্থা রয়েছে। একটি হারবিফোর সাফারি, মোট ৯১ হেক্টর এলাকা। আর একটি টাইগার সাফারি, মোট ২০ হেক্টর এলাকা।

হারবিভোর সাফারিতে শাল ও বিভিন্নরকম শালজাতীয় গাছের মেলা যেমন দেখা যাবে, তেমনই হরিণ, ময়ূর, গন্ডারও দেখা যাচ্ছে। আর টাইগার সাফারিতে দুটো বাঘ দেখা যাচ্ছে। একটি পুরুষ, নাম স্নেহাশিস। অপরটি স্ত্রী বাঘ, নাম শীলা। গত ডিসেম্বর মাসে চালু হয় এই টাইগার সাফারি। তবে পুরুষ বাঘ স্নেহাশিস যেহেতু বেশি হিংস্র, তাই তাকে বেশির ভাগ সময়ই খাঁচাতে কাটাতে হচ্ছে। তার পরিবর্তে স্ত্রী বাঘ শীলা দর্শনার্থীদের মন ভরিয়ে চলেছে। সাফারি সূত্রের খবর, প্রথমে স্নেহাশিসকেই ছাড়া হয়েছিল দর্শকদের মনে আনন্দ দিতে। কিন্তু সে খাঁচা থেকে বার হওয়ার পর বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে খাঁচায় প্রবেশ করতে চায় না। তাকে খাঁচায় প্রবেশ করাতে বেশ হিমশিম খেতে হয় সেখানকার কর্মীদের। অন্য দিকে শীলা বেশ নিয়মের মধ্যে সকাল

সাড়ে ন'টার মধ্যে তার খাঁচা থেকে বার হয়, আর ঠিক সাড়ে চারটের মধ্যেই খাঁচায় প্রবেশ করে।

হারবিভোর সাফারিতে বিভিন্নরকম শালজাতীয় গাছপালার পাশাপাশি হরিণ, ময়ূরও দেখা যায় অনেক। দেখা যাচ্ছে একটি গন্ডারও। কর্তৃপক্ষের হিসাবে, সেখানে এখন ময়ূর রয়েছে দু'শোটি। আর হরিণের সংখ্যাও দু'শোর কিছু বেশি। রয়েছে কয়েকটি ঘড়িয়াল। আগামীতে ভল্লুক সাফারির পাশাপাশি লেপার্ড সাফারি, বিভিন্নরকম লেপার্ড জাতীয় ক্যাট সাফারির ব্যবস্থা হচ্ছে। থাকছে অনেকরকম পাখি, মাছ, কচ্ছপ এবং কুমিরও। সকাল ন'টার মধ্যেই সাফারি পর্ব শুরু হয়ে যায়। টিকিট কাউন্টার বিকেল পর্যন্ত খোলা থাকে। শিলিগুড়ি থেকে অটো, টোটো ছাড়া বাসেও সেই পার্কে যাওয়া যায়। গাড়ি রাখার বিশেষ পার্কিং ব্যবস্থা রয়েছে। টিকিট কাটা যেতে পারে অনলাইনও। নর্থ বেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিমাল পার্ক বা 'বেঙ্গল সাফারি ডট ইন' দিয়ে গুগলে সার্চ করলেই অনেক কিছু জানা যাবে। ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভয়েস কলেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু কেন এই পার্ক ইতিমধ্যে অনেকের কাছে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠছে, প্রশ্ন করলে সেখানকার আধিকারিক অরুণ মুখোপাধ্যায় জানান, শিলিগুড়ির এই বেঙ্গল সাফারি পার্ক অনেকগুলো কারণেই গোটা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠছে। প্রথমত, মুক্ত অরণ্যে এইরকম বাঘজাতীয় ক্যাট সাফারি বিশ্বে সেভাবে কোথাও নেই। পশ্চিমবঙ্গে তো এরকম সাফারি এই প্রথম। দেশের মধ্যে বেঙ্গালুরুর বানারহাটে একটা এরকম সাফারি পার্ক থাকলেও সেখানে এত সুন্দর জঙ্গল নেই। আর মুক্ত আকাশের নিচে জঙ্গলে এরকম টাইগার সাফারি সেখানে নেই। এর পর লেপার্ড সাফারি শুরু হলেও সেটাও ব্যতিক্রমী হয়ে উঠবে। কারণ, বিশ্বের কোথাও মুক্ত জঙ্গলে লেপার্ড সাফারির ব্যবস্থা নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে লেপার্ড সাফারি গোটা বিশ্বে প্রথম পরীক্ষামূলক এক ব্যতিক্রমী সাফারি পার্ক। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটক, এমনকি জার্মানি থেকে আসা কয়েকজন পর্যটকও এই সাফারি পার্ক দেখে প্রশংসা করে গিয়েছেন। ঠিক হয়েছে, ২০১৮ সালের মধ্যে পুরো সাফারি পার্কের প্রকল্প কাজ শেষ করা হবে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৫ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। সেখানে সাফারি থেকে রাজ্য সরকারের আয় এখন পর্যন্ত হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা। আর দর্শক এসেছেন গত মার্চ পর্যন্ত দু'লক্ষ পঁচিশ হাজার। এ বছর পুজোর আগেই ভল্লুক

সাফারি চালু করার প্রয়াস চলছে বলে অরুণবাবু জানিয়েছেন। তারপর লেপার্ড সাফারি ও হাতি সাফারির ব্যবস্থাও হবে। দর্শকের বিচারে এর রেটিং চলছে ৪.১। এবারে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতেই ছাত্রছাত্রীদের ভিড় বেড়েছে অনেক। তবে এই সাফারি পার্ক চালু হতেই খুশি শিলিগুড়ির টুর অপারেটররা। উত্তরের পর্যটন ব্যবসায় পরিচিত মুখ রাজ বসু। তিনি বললেন, 'এখন শিলিগুড়িতে পর্যটকরা এলে আমরা বলতে পারছি, বেঙ্গল সাফারি পার্ক চলুন। আর পর্যটকরা তা মেনে নিচ্ছেন। এরকম পার্ক সত্যিই বিরল।' শিলিগুড়ির আরেক টুর অপারেটর বাপন মণ্ডল বলেন, অনেক পর্যটক আগে শিলিগুড়ি এলে একটা দিন এখানে থাকতে চাইতেন না। কী করবেন, বোরিং ফিল করতেন। তাঁরা এখন সকলে বেঙ্গল সাফারি যেতে দ্বিধাবোধ করছেন না। দারুণ ভিড় বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য এটা একটা বিরাট উপহার দিয়েছেন। তবে পর্যটন ব্যবসায়িরা এখন বেঙ্গল সাফারির পাশে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল ঘেঁষে হোম টুরিজমের প্রস্তাব দিচ্ছেন। পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব প্রায়ই বেঙ্গল সাফারি পর্যবেক্ষণ করে সেখানকার কাজ খতিয়ে দেখছেন। বাকি কাজ কবে শেষ হবে, তার বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি বৈঠকও করছেন। গৌতমবাবু বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ জুড়ে উন্নয়ন শুরু করেছেন। পাহাড় থেকে সমতলে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। বেঙ্গল সাফারিও এর মধ্যেই পড়ে। বেঙ্গল সাফারি হওয়ার পর পর্যটন মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের অন্য দিক তৈরি হয়েছে। সামনে বহু কিছু অপেক্ষা করছে বেঙ্গল সাফারির জন্য। প্রতিদিন সেখানে ভিড়ও বাড়ছে। সাফারি ঘোরার জন্য রয়েছে অনেক বাসের ব্যবস্থা। প্রতি মুহূর্তেই সাফারির ভিতরে গিয়ে বাসে চাপার ব্যবস্থা রয়েছে। সাফারিতে অনেকে পিকনিক করতেও যাচ্ছেন।

বাপি ঘোষ

দেবপ্রসাদ রায়

আন্তর্জাতিক যুবসম্মেলনের কনভেনর হলেন লেখক। সেখানে এক বিচিত্র সমস্যা। সম্মেলনের দিন হাতে কম নয়, বরং উদ্‌বৃত্ত সময়। তাহলে কি অন্তত চল্লিশ মিনিট চুপচাপ বসে অপেক্ষা করবেন প্রতিনিধি এবং দর্শকরা? এই অবস্থায় এগিয়ে যিনি এলেন, তিনি স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী। লেখকের মনে হয়েছিল যে, সে দিন তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে এগিয়ে আসেননি, বরং যুবসম্মেলনের সন্তানসম উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মাতৃস্নেহে। এ পক্ষের স্মৃতিচারণায় সেই ঘটনার পাশাপাশি রয়েছে আরও কৌতূহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ।

।।৩১।।

আমরা সহযোগীরা যে কয়েকটি প্রস্তাব রাজীবজিকে দিয়েছিলাম, তার ভিতর আমার ২০ দফাকে কেন্দ্র করে যেমন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের প্রস্তাব ছিল, তেমনই গুলাম নবির দেওয়া জাতীয় স্তরে যুব কংগ্রেসের একটি সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক স্তরে একটি যুবসম্মেলন করবার পরামর্শও ছিল। আমার পরে মনে হয়েছে, ওর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। ও বুঝতে পেরেছিল, রাজীবজি যখন যুব কংগ্রেসকে মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছেন, তাহলে ওঁর আনুষ্ঠানিক যোগদান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে উপস্থাপিত করবার সবচেয়ে ভাল মাধ্যম হল দু'টি স্তরে দু'টি সম্মেলন।

ঠিক হল, জাতীয় সম্মেলন ব্যাঙ্গালোরে হবে। '৮১-র জুন মাসে 'সঞ্জয় পাখোয়ার' হয়ে গিয়েছে। আর ডিসেম্বরে জাতীয় সম্মেলন। যদিও রাজ্য যুব সভাপতি ছিল কে কে জর্জ, কিন্তু মূলত সব দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী গুন্ডু রাও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। এই রাজ্যে তখন সোমেনদা সভাপতি। আমি প্রস্তুতি কমিটির সঙ্গে অনেক আগেই ব্যাঙ্গালোর পৌঁছে গিয়েছিলাম। কর্ণাটকে গুন্ডু রাও মুখ্যমন্ত্রী হলেও তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল জাফর শরিফের অনুগামী যুব কংগ্রেসের একটা অংশ। বালাজি, রমেশ বাবু, নাসির আহমেদ, জেভিয়ার অস্কার— এরা সব বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর লোক। তাদের সম্মেলনে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে বিরত রাখা একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঘটনাচক্রে আমি তখন কর্ণাটকের দায়িত্বে ছিলাম। যা-ই হোক, সবাইকে নিয়ে অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করতে পারাতে কোনও সমস্যা শেষ পর্যন্ত হয়নি। আসলে জর্জের সঙ্গে কারও কোনও গোলমাল ছিল না। সবাই ওকে পছন্দ করত। কিন্তু রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হরিপ্রসাদকে নিয়ে প্রবল অসন্তোষ ছিল। কারণ ও মূলত মাসলম্যান হিসাবেই পরিচিত ছিল।

সম্মেলন চলল তিন দিন। আমি ব্যাঙ্গালোরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ছিলাম। ব্যাঙ্গালোরে ডেলিগেটরা যখন এল, ওদের অস্থায়ী শিবিরে জায়গা হল। সোমেনদা ওদের সঙ্গে থাকাই পছন্দ করলেন, যদিও রাজ্য সভাপতিদের জন্য হোটেলে অ্যাকমডেশন ছিল। কিন্তু উনি কোনওভাবেই সে আতিথ্য গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। যা-ই হোক, আমি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ইকনমিক রেজোলিউশন মুভ করলাম। বীরেনদা পরে পিঠ চাপড়ে বললেন, 'তুই নিজেকে খুব ভাল "শেপ আপ" করেছিস। আমার খুব গর্ব হচ্ছে।' আসলে আমি আর বীরেনদা একসঙ্গেই সুব্রতদার সুপারিশে বারিদবরণ দাসের রাজ্য কমিটিতে ছিলাম। কিন্তু '৭৭-এর বিপর্যয়ের পর সুব্রতদা যখন সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করছে, আমরা দু'জন ঠিক করলাম, আমরা ইন্দিরা গান্ধির অনুগামী হয়েই থাকব, আর ওঁর সঙ্গে রাজ্যে যাঁরা আছেন বলে নিজেদের চিহ্নিত করেছেন, তাঁদের সঙ্গে টিম করব। তাই বালিগঞ্জ ছেড়ে আমাদের রোজকার ঠিকানা হল ৪৫ নং আমহার্স্ট স্ট্রিট। সোমেনদার ঠেক। বীরেনদা তো ওখানে আস্তানাও নিয়ে নিল।

আসলে ৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রিট কোনও কালে ডঃ কার্তিক বসু বলে একজন বিখ্যাত ডাক্তারের চেম্বার কাম ল্যাবরেটরি ছিল। বিশাল এলাকা জুড়ে বাড়ি। প্রায় সবটাই দখল হয়ে গিয়েছে। দখলদারদের ভিতর সবচেয়ে বেশি জায়গা যাঁর কবজায়, তিনি সোমেনদা, নিজের তিন/চারখানা ঘর ছিল। তার ভিতর একটা বীরেনদাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। বীরেনদা বউবাজারে স্কুলে পড়াতেন। ফলে ওঁরও সুবিধে হয়ে গেল। দুর্ভাগ্য, যখন দলের সুসময় এল, তখন পথদুর্ঘটনায় বীরেনদা মারা যান। '৮৪ সালে বাঁকুড়ায় ভোটের প্রচারে গিয়েছিলেন।

আমি আজ যে সিআইটি-র ফ্ল্যাটে আছি— সুব্রতদাকে বলে বীরেনদাই আমায় পাইয়ে দিয়েছিলেন। জানতেন, সংসার, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা— এসব নিয়ে রাজনীতিতে বেশি ঝুঁকি নেওয়া যাবে না। তাই নিজে যা হতে পারেননি, চাইতেন 'মিঠু' হোক। অসম্ভব স্নেহ ছিল আমার প্রতি। আর ইংরেজিটা জানতেন মাতৃভাষার মতো। ফলে বীরেনদা পিঠ চাপড়েছেন মানে একটা পরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছি। আমার নিজেরও মনে হয়েছে, আমার ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনে বক্তৃতা ও মঞ্চের উপর বসেই ইংরেজিতে শোক প্রস্তাব লিখে দেওয়া রাজীবজির মনে খানিকটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তার জন্যই হয়ত ঠিক জাতীয় সম্মেলনের এক মাসের মাথাতেই যখন আন্তর্জাতিক যুবসম্মেলন করবার সিদ্ধান্ত হল, আমাকে তার কনভেনের করে দেওয়া হল।

বিষয়টা নিয়ে কোনও ধারণা ছিল না। তবুও সাহস করে 'হ্যাঁ' বললাম। আলাদা অফিস হল। ২৪, গুরুদ্বারা রাকাবগঞ্জ রোডে। জন বলে জগদীশ টাইটলারের একজন কেরালিয়ান স্টেনো ছিল। তাকে আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। অনিল মাথরানি তখন আমার সহযোগী। অসম্ভব ভাল পিআর। ও বলল, 'ডেলিগেট আনবার জন্য তুমি চিন্তা কোরো না, আমি ১০০টা দেশের প্রতিনিধি নিয়ে আসব।' কমিউনিকেশন স্কিল এত ভাল ছিল যে, বাংলাদেশের হাই-কমিশনারকে ফোন করবার পর, তিনি পরে আমায় ফোন করে বলেছিলেন, 'আমি ডেলিগেট পাঠাতে পারি একটা শর্তে। আমায় যে ফোন করেছিল, সে যদি আমার এমব্যাসিতে এসে এক কাপ চা খেয়ে যায়।' বাংলাদেশে তখন জিয়াউর রহমানের শাসন চলছে। শেষ পর্যন্ত ৭৪টি দেশের কনফার্মেশন পাওয়া গেল।

এদিকে কনফারেন্সের আলোচ্য বিষয় 'প্রবলেমস অব হিউম্যান সারভাইভাল' আর প্রতিনিধি আসবে ইরান ও ইরাক থেকে, নর্থ কোরিয়া-সাউথ কোরিয়া থেকে, নর্থ ইয়েমেন-সাউথ ইয়েমেন থেকে, ইস্ট জার্মানি-ওয়েস্ট জার্মানি থেকে। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। প্রস্তুতি যখন প্রায় শেষ, তখন একদিন তদানীন্তন বিদেশ মন্ত্রী নরসীমা রাওয়ের কাছে যাওয়া হল। তিনি শুনে বললেন, 'তোমরা কি পাগল! মারামারি করানোর জন্য এসব পরস্পর বিরোধী দেশগুকে ডেকেছ! তা-ও আবার আলোচনা হবে একটা অত্যন্ত

আমরা গেলাম সাউথ ব্লকে। ইন্দিরাজি শুনলেন। তারপর ফোন তুলে নরসীমা রাওকে বললেন, 'বচ্চে লোগ কুছ কর রহে হ্যায়, আপ কিউ আরঙ্গা ডাল রহে হ্যায়?' তাতেই ভোলবদল। উনি নিজেই আবার আমাদের ডেকে পাঠালেন। এবার একদম অন্য সুর, কী কী করতে হবে, কোন কোন ডেস্কের সাহায্য লাগবে— দরাজ হাতে সব করার জন্য তৈরি।

স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে। আমি অন্তত এ ছেলেখেলায় অংশীদার হতে পারব না।' বিদেশ মন্ত্রীর সরে দাঁড়ানো মানে প্রোগ্রামটাই বাতিল। আমাদের তো মাথায় হাত! সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। ৭৪টা দেশের কনফার্মেশন এবং ট্রাভেল প্ল্যানও এসে গিয়েছে। এখন বাতিল বললেই তো আর বাতিল করা যাবে না। গুলাম নবি বলল, 'চলো, ম্যাডামকে গিয়ে ধরি। এখন একমাত্র উনিই বাঁচাতে পারবেন।'

সময় নেওয়া হল। আমরা গেলাম সাউথ ব্লকে। ইন্দিরাজি শুনলেন। তারপর ফোন তুলে নরসীমা রাওকে বললেন, 'বচ্চে লোগ কুছ কর রহে হ্যায়, আপ কিউ আরঙ্গা ডাল রহে হ্যায়?' তাতেই ভোলবদল। উনি নিজেই আবার আমাদের ডেকে পাঠালেন। এবার একদম অন্য সুর, কী কী করতে হবে, কোন কোন ডেস্কের সাহায্য লাগবে— দরাজ হাতে সব করার জন্য তৈরি। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কতকগুলো দায়বদ্ধতা আছে, তাকে মানতেই হয়। সেটাই প্রথা হিসেবে সর্বত্র মানা হয়ে থাকে। প্লেনারি, কমিটি মিটিং, ড্রাফটিং গ্রুপ, ডিক্লেয়ারেশন, ভ্যালিডিক্টরি সেশন— এগুলো সব বাধ্যতামূলক দায়বদ্ধতা এবং এর জন্য দরকার পেশাদারিত্ব।

আমরা এই কনফারেন্স সার্ভিসের দায়িত্বটা অনুরাধা বক্সী নামে এক মহিলাকে দিয়েছিলাম, যে জেএনইউ থেকে বিভিন্ন বিদেশি ভাষা জানা ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা অস্থায়ী কনফারেন্স সচিবালয় গড়ে তুলেছিল।

সব প্রস্তুতিই ঠিক ছিল। প্লেনারি চলবে সকাল ৯টা ১৫ থেকে ১১টা। তারপর ১৫ মিনিটের চা-পানের বিরতি। তারপর বিজনেস সেশন। সেখানে বহিরাগতদের কোনও প্রবেশাধিকার নেই। তারপর মধ্যাহ্নভোজ এবং বিকেলে কমিটি মিটিং। তারপর কমিটির সুপারিশ একত্রিত করে ড্রাফটিং গ্রুপের মিটিং এবং ড্রাফটিং গ্রুপ ডিক্লেয়ারেশন চূড়ান্ত করবার পর আবার প্লেনারি এবং ভ্যালিডিক্টরি সেশন। তিনটি দিনই ঘটনাবহুল।

কিন্তু গোড়ায় একটা গলদ থেকে গিয়েছিল। এ সমস্ত সম্মেলনের একটা ট্রায়াল রান হয়, দেখার জন্য যে, যে ইভেন্টের জন্য যত সময় দেওয়া হচ্ছে তা-ই লাগছে, না কমবেশি হচ্ছে। সেটা করা হল না। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো একদিন আগের রাতে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা জানিয়ে দিলেন, অচেনা বিদেশি অতিথিদের ওঁরা প্রধানমন্ত্রীর সামনে আসতে দেবেন না। সে জন্য ৪০ মিনিট সময় ধরা ছিল। তার মানে প্রথম দু'ঘণ্টা থেকে ৪০ মিনিট বাদ। গুলাম নবি সব সময়েই বিন্দাস। বলল, 'কোনও ব্যাপার না, ৯টা ৪৫-এ শুরু করব। তাহলে ম্যানেজ হয়ে যাবে।' কিন্তু কনফারেন্সটা শুরু করার প্রাথমিক দায়িত্ব আমার উপর ছিল। কারণ আমি ছিলাম সেক্রেটারি জেনারেল। আমি ওপেন করে গুলাম নবিকে আমন্ত্রণ জানাব। ও এসে চেয়ারম্যান হিসাবে সভা পরিচালনা করবে।

৯টার ভিতর বিজ্ঞানভবন কানায় কানায় পরিপূর্ণ এবং বেশির ভাগই ডিপ্লোম্যাট। তারা তো জানে সওয়া ন'টায় শুরু হবে। ৯টা ২০-তে আমাকে অরুণ নেহরু ডেকে বলল, 'কী ব্যাপার, শুরু করছ না কেন?' আমি বললাম, 'গুলাম নবি বলেছে ৯টা ৪৫-এ শুরু করতে।' অরুণ নেহরু গর্জে উঠে বলল, 'হোয়াট ননসেন্স। এতগুলো ডিপ্লোম্যাট গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে আধ ঘণ্টা ধরে! এক্ষুনি যাও, কনফারেন্স ওপেন করো।'

আমি সোজা মঞ্চে গিয়ে কনফারেন্স ওপেন করে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে গুলাম নবিকে আমন্ত্রণ জানালাম চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করার জন্য। ও তখন পিছনের সারিতে বসে ওর 'কি নোট অ্যাড্রেস'টা পড়ছিল। মাইকে আমার ডাক শুনে হন্তদন্ত হয়ে এসে নিচু গলায় বলল, 'উল্লু কে পঠ্‌ঠে, আপনে কিউঁ মুঝে মারওয়া?' আমি বললাম,

বেড়াতে চলুন আন্দামান

গ্রুপ টুর
যাত্রা শুরু
২১ মে ২০১৭
(পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পোর্ট ব্লেয়ার)
আসন সীমিত

৭ রাত ৮ দিনের প্যাকেজ টুর

পোর্ট ব্লেয়ার	-	৪ রাত
হ্যাভলক	-	২ রাত
নীল	-	১ রাত

প্যাকেজ রেট
১৭,৮৫০ টাকা (জন প্রতি)
১৬,৯০০ টাকা (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৪,৩০০ টাকা (৫-১১ বছর)
৮,৯০০ টাকা (২-৪ বছর)
(দ্রষ্টব্য: বিমান ভাড়া ব্যতীত প্যাকেজ রেট)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
সাইট সিইং, পরিবার প্রতি ঘর, নন-এসি গাড়ি, খাওয়া (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার), সরকারি বোট, সকল পারমিট

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

HOLiDAYAAR

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928

Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969

Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

দিল্লির বিজ্ঞানভবনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুবসম্মেলনের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে ইন্দিরা গান্ধি, দেবপ্রসাদ রায়, গুলাম নবি আজাদ ও আনন্দ শর্মা।

'যা বলার অরুণ নেহরুকে বলো।'

ম্যাডাম উদ্‌বোধক হিসাবে সময়মতোই এসে গিয়েছেন। উনি ওঁর উদ্‌বোধনী ভাষণ দিলেন। আমার একটা কথা খুব মৌলিক বলে মনে হয়েছিল এবং আজও মনে আছে। ম্যাডাম বললেন, 'ওয়ার বিগিনস ইন হিউম্যান মাইন্ড। সো ইজ দ্য পিস। ইট অলসো বিগিনস ইন হিউম্যান মাইন্ড।' বাকি কথাগুলো মনে নেই। কারণ তখন টেনশন শুরু হয়ে গিয়েছে। সময় কীভাবে ১১টা পর্যন্ত গড়াবে। ম্যাডাম সব মিলিয়ে মিনিট বিশেক বললেন। তারপর গুলাম নবি ওর লিখিত ভাষণ পাঠ করতে উঠল, যার পোশাকি নাম 'কি নোট অ্যাড্রেস'। তখন মঞ্চে কেবল আমি আর ইন্দিরাজি। জানুয়ারির শীত। কোট-প্যান্ট পরে আছি। তা সত্ত্বেও দরদর করে ঘামছি। ম্যাডাম আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমহে ইতনা পরেশান কিউঁ লগ রহা হ্যায়?' আমি বললাম, 'ম্যাডাম, প্রোগ্রামে ৪০ মিনিট ছিল তোমার সঙ্গে ডেলিগেটদের পরিচয় পর্ব; তা বাদ গিয়েছে সিকিউরিটির চাপে, গুলাম নবি আর মিনিট পাঁচেক বলবে, ১০টা ১০ বাজে। বাকি সময়টা কী করব! ১১টার আগে তো চা রেডি হবে না। উনি বললেন, 'মুঝে পহলে কিউঁ নহি বোলা? ম্যায় লম্বা ভাষণ কর দেতি। অব দেখতা হুঁ গুলাম কিতনা সময় লেতে হ্যায়।' ১০টা ১৫-য় গুলাম নবি শেষ করল। ম্যাডাম মাইকে চলে গিয়ে বললেন, 'I would like to get personally introduced to all the delegates.' তখন এসপিজি তৈরি হয়নি। তাই ম্যাডামের কথাই শেষ কথা ছিল। এক-এক করে ফরেন ডেলিগেটদের ডাকা হতে লাগল। ভারতীয় দলটির নেতা ছিলেন রাজীবজি। তাই ইন্ডিয়ার নাম ডাকতে ম্যাডাম বললেন, 'ওদের ডাকতে হবে না। ওরা আমার পরিচিত।'

গোটা পর্ব যখন শেষ হল, তখন ১০টা ৫০। উনি বললেন, 'বিয়িং দ্য ইনোগুরেটর অব দ্য কনফারেন্স, আই স্পোক ইন ইংলিশ। বাট বিয়িং দ্য প্রাইম মিনিস্টার অব ইন্ডিয়া, আই নিড টু স্পিক এ ফিউ ওয়ার্ডস ইন হিন্দি।' হিন্দিতে ভাষণ শেষ করলেন। ঘড়িতে ১১টা বাজে। আমার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন, 'অব ঠিক হো গিয়া না?' আমি ইন্দিরাজির মাতৃরূপটা দেখতে পেলাম!

'৮২ আন্তর্জাতিক যুবসম্মেলন একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সারারাত ধরে ড্রাফ্‌টিং গ্রুপের মিটিং এবং বিবদমান দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা সহমত তৈরি করা একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

দ্বিতীয় দিন একটা মজার ঘটনা ঘটল। বাংলাদেশের প্রতিনিধি বলল, 'আমি আমার রাষ্ট্রভাষা বাংলায় বলব।' সাধারণত এ ধরনের সম্মেলনে ৬টা ইউএন ল্যাঙ্গুয়েজের অনুবাদের ব্যবস্থা থাকে। বাংলা তার ভিতর পড়ে না। জগদীশ টাইটলার বলল, 'ডিপি, তুমি এর দোভাষীর কাজ করো। ভাল জেসচার হবে।' আমি রাজি হয়ে গেলাম। ও এক প্যারা করে বলছে, আর আমি তরজমা করছি। তবে শেষে 'খুদা হাফেজ'টার আর অনুবাদ করতে না পেরে আমিও 'খুদা হাফেজ' বলে শেষ করলাম। তারপরেই লাঞ্চ ব্রেক হল। সব বিদেশি ডেলিগেট আমায় কনগ্র্যাচুলেট করে বলছে, তুমি যে দুটো বিদেশি ভাষা এত ভাল জানো তা এখন বুঝতে পারা গেল। আমিও খোলসা করে বললাম না যে দ্বিতীয়টা আমারও মাতৃভাষা!

(ক্রমশ)

উত্তরের অর্থনীতিতে পরিবহণ ব্যবসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে

উত্তরবঙ্গের গ্রামের মানুষ আজও মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। ডুয়ার্সের বহু সংখ্যক মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তন করত চা-বাগানকে কেন্দ্র করে। চা-বাগানের নানারকম চাহিদা এবং কর্মী/শ্রমিকদের প্রয়োজনে বেশ কিছু জনপদ গড়ে ওঠে। যেমন— মালবাজার, ডামডিম, মেটেলি, বীরপাড়া, নাগরাকাটা, কালচিনি, মাটিগাড়া, মিরিক ইত্যাদি ইত্যাদি— নামের তালিকা বেশ বড়। পরিবহণ ব্যবসা উর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলে। মূলত যাত্রীবাহী বাস এবং মাল পরিবহণের ট্রাক। পরিবহণ ব্যবসাতে বহু সংখ্যক মানুষ যুক্ত ছিল। পরিবহণের ক্ষেত্রে ট্রেনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল না— বিশেষত স্বাধীনতা-পরবর্তী ২৫ বছর। ১৯৭২ সনে ফারাক্কা ব্যারেজের উপর দিয়ে ট্রেন ও অন্যান্য ভূতল পরিবহণ চালু হওয়ার পর রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ওই ২৫ বছর উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের পথে কাঁটা ছিল কলকাতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগব্যবস্থা না থাকা। হায়, কী পরিহাস— জলপাইগুড়ি সদরের সঙ্গে রাজগঞ্জ ও সদর ব্লক ছাড়া অন্য ১১টা ব্লকের সরাসরি বাধাহীন যোগাযোগ ছিল না। কারণ, জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তিস্তায় কোনও সেতু ছিল না। ১৯৬৫ সনে তিস্তা সেতু তৈরি হওয়ার পর ডুয়ার্সের যোগাযোগব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। ইতিমধ্যে এনজেপি স্টেশন স্থাপিত হয়, আসামের সঙ্গে ব্রডগেজ লাইনে সরাসরি যোগাযোগব্যবস্থা চালু হয় এবং বেশ কিছু নতুন ট্রেনও চালু হয়।

উত্তরপক্ষ

প্রশান্ত নাথ চৌধুরী

আমার আজকের আলোচনা ডুয়ার্সে সড়ক পরিবহণের বিভিন্ন অধ্যায়। ১৯৬৫-র পূর্বে জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার বা কোচবিহার যাওয়ার সরাসরি বাস ছিল না। কারণ জলপাইগুড়ি থেকে তিস্তা নদী পার হওয়া ছিল দারুণ অসুবিধের। রিকশা করে জেলাশাসকের অফিসের কাছে ঘাটে পৌঁছে বিচিত্র চেহারার ট্যাক্সি ও নৌকা চড়ে, কখনও বেশ কিছুটা হেঁটে ওপারের বার্জিশে পৌঁছে ডুয়ার্সের সব প্রান্তের বাস পাওয়া যেত। হোগলার জঙ্গলের পাশ দিয়ে, কাশবন ছুঁয়ে, বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে বিশাল শব্দে ট্যাক্সির পথপরিক্রমা এখনও বহু প্রবীণের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। সত্যজিৎ রায় তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র 'অভিযান'-এ ওইরকম একটি ট্যাক্সিই ব্যবহার করেছেন। আর সেই গাড়িগুলোতে যে কত মানুষ ও বাক্স-প্যাঁটরা চাপানো হত তা বর্ণনা করা যাবে না। তারপর কিছুটা নৌকায় চেপে, কখনও কিছুটা পায়ে হেঁটে বাসের হদিশ মিলত। তার ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় ছিল না। তবে চলতে শুরু করলে গন্তব্যে পৌঁছানোর ভরসা ছিল। বাসের ড্রাইভার, কন্ডাক্টরদের সঙ্গে যাত্রীকুলের বন্ধুত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। নাম ধরে বা কাকু-জেঠু করে ডাকাডাকি চলত। এই বাসগুলো ছিল ডুয়ার্সের লাইফলাইন।

ময়নাগুড়ির বহু মানুষ পরিবহণ ব্যবসা এবং গাড়ি সারাইয়ের কাজে নিযুক্ত ছিল। আলিপুরদুয়ার যেতে হলে হাসিমারা, কালচিনি, রাজাভাতখাওয়া হয়ে যেতে হত। তখনও এলআরপি-র বড় রাস্তা তৈরি হয়নি। আসলে ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের পর এইসব অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব বাড়ে এবং পরিকাঠামো তৈরির দিকে নজর দেওয়া হয়। রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি তৈরি হওয়ার ফলে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। রাজাভাতখাওয়াতে তখন ডিমা নদীর উপর সেতু ছিল না। বর্ষায় নদীর জল হু হু করে বেড়ে যেত, গাড়িগুলো সার বেঁধে নদীর মুখে দাঁড়িয়ে যেত। জল কমলে আবার যাত্রা।

জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়িতে তখন বেশ কিছু সম্পন্ন মানুষ পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। প্রচুর ট্রাক চলাচল করত নানা সামগ্রী নিয়ে, আর উত্তরবঙ্গ থেকে চা-পাতা, বনজ দ্রব্য, বালি-পাথর, পাট এবং কিছুটা তামাক অন্য রাজ্যে বা এই রাজ্যের অন্য জেলায় সরবরাহ করা হত। পণ্যসামগ্রী চলাচলের মূল পরিবহণ ছিল ট্রাক।

পঞ্চম দশকে জলপাইগুড়িতে কোম্পানির আদলে তৈরি হল 'জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি বাস সিন্ডিকেট'। কদমতলাতে অর্থাৎ শহরের কেন্দ্রস্থলে তাদের গ্যারেজ ও অফিস। শিলিগুড়িতে থানার বিপরীতে তাদের বাস আড্ডা। প্রায় পঞ্চাশজন কর্মী কাজ করত। পরিচালন কর্তা রজত গুহঠাকুরতা, ধবধবে সাদা ধুতি-কুর্তা পরিহিত সুপুরুষ। উকিলপাড়ার একটি বাড়িতে থাকতেন। মহন্তপাড়া, জলপাইগুড়ি নিবাসী তুষারকান্তি মিত্র জানান যে, যৌবনে রজতবাবু ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় একটি নৌকায় একজন অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকে হত্যা করেন, এবং পালিয়ে এসে কদমতলার বৈকুণ্ঠ ঘোষের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রজতবাবুর সঙ্গে সহযোগী হিসাবে নারায়ণ নন্দী, সাধন বোস প্রমুখ নাগরিক পরিবহণ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে অশীতিপর নাগরিক নৃপেন্দ্র সরকারের সঙ্গে বসেছিলাম। তিনি জানালেন, স্বাধীনতার আগে জলপাইগুড়ি

থেকে চাউলহাটি দিয়ে বোদা হয়ে তেঁতুলিয়া-পচাগড় বাস চলাচল করত। ওঁর স্মৃতি কিছুটা ধূসর। উনি বললেন, বাংলাদেশের সংসদের স্পিকার মহঃ জমিরুদ্দিন সরকার তাঁদের উকিলপাড়ার বাড়িতে থেকে এসি কলেজে পড়াশোনা করেছেন। তাঁর পাঠানো বেশ কিছু কার্ড নৃপাদার পুত্র আমাকে দেখালেন। উনি বিভিন্ন চা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায় যুক্ত ছিলেন। কথায় কথায় বললেন, 'চাকরি করিনি স্বাধীন ব্যবসা করব বলে। একটা ট্রাকে আর কত ব্যবসা হবে?'

বাস সিন্ডিকেটের আর-একজন পার্টনার নারায়ণ নন্দী বেশ কিছু আগে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর পুত্র অরুণ নন্দীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। স্বাধীনতার পূর্বে তাঁদের পরিবার পূর্ব পাকিস্তানের পচাগড় থেকে জলপাইগুড়ি বাস চালাত। নাম ছিল নন্দী ট্রান্সপোর্ট। স্বাধীনতার পর ওঁরা জলপাইগুড়ি এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনটি বাস নিয়ে নন্দী ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা ছিল। জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে বাস চলত। সেই সময় গাড়ির পারমিট বিলি শুরু হয়। নন্দীদের ২টি বাস, আবারানি বোস (সাধন বোসের মা)-এর ১টি বাস, রজতবাবুর ১টি এবং শচীনবাবুর ১টি— মোট ৫টি বাসের পারমিট নিয়ে একসঙ্গে ব্যবসা শুরু হয় পাঁচের দশকে। কুড়ি বছর চুটিয়ে ব্যবসা করে ধীরে ধীরে অবনতি শুরু হয়। ১৯৮০ নাগাদ ব্যবসা স্তব্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা দল বেঁধে মালিকদের বাড়ির দরজায় দাবি নিয়ে ধরনা দিয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। জলের দামে সিন্ডিকেটের সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যায়।

মূলত ছয়ের দশকের প্রারম্ভে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা গতি বাড়িয়ে ছুটতে শুরু করে। রাজ্যের সর্বত্র এবং আসাম, মেঘালয়, বিহারে ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়। কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্রে বাস আড্ডা, গ্যারেজ ইত্যাদি তৈরি করা হয়। সর্বদা প্রাণচঞ্চল ও লোকজনের আড্ডা। অনবরত মাইক্রোফোনের বাসযাত্রার সময় ঘোষণা চলে। উত্তরবঙ্গের সমস্ত ছোটবড় শহরে বাস ডিপো গড়ে ওঠে। দক্ষিণবঙ্গেও অনেকগুলো ডিপো তৈরি হয়। কলকাতায় উলটোডাঙাতে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাস ডিপো, এসপ্ল্যানেড থেকে দূরদূরান্তের বাস ছাড়ে। সাতের দশকে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি থেকে রকেট বাস যাত্রা শুরু করে। পরে অন্য আরও কিছু ডিপো থেকেও রকেট বাস চালু হয়। শুরুতে রকেট বাসে কলকাতা যাওয়া ছিল কৌলীন্যের লক্ষণ।

নীল রঙের বাস অনেক প্রাইভেট বাসের মালিকই নকল করেন, কারণ উত্তরবঙ্গের মানুষ ওই নীল বাসের অনুরাগী ছিলেন। কলকাতা ছাড়া দোতলা বাস বোধহয় এই বাংলায় কেবল কোচবিহারে চলত। কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জ এবং কোচবিহার-সোনাপুর রুটে চলতে দেখেছি।

একসময় আইএএস অফিসার থাকতেন পরিচালনার শীর্ষে। আটের দশকে রাজনৈতিক দলের নেতারা ওই পদে বসতে শুরু করলেন। অপরিকল্পিতভাবে লোক নিয়োগ চলতে থাকে। একসময় গাড়িপিছু কর্মীসংখ্যা প্রায় ১২ জনে পৌঁছায়। সরকারের ভরতুকির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এমনকি সরকারি তেল কোম্পানি জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। কর্মচারীদের বেতন, অবসরকালীন প্রাপ্য টাকা দিতে অসুবিধে দেখা যায়। স্বেচ্ছা অবসর প্রকল্প চালু হয়, নতুন নিয়োগ বন্ধ হয়। সরকারি বিনিয়োগে প্রচুর নতুন গাড়ি আসে। জওহরলাল নেহরু ন্যাশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন প্রকল্পে আধুনিক ঝকঝকে বাস বিভিন্ন রুটে চালু হয়। মাঝে প্রাইভেট বাসের বিশাল দাপট শুরু হয়েছিল নির্দিষ্ট কিছু রুটে। এবার জেএনএনইউআরএম প্রকল্পে বাস এলে তারা সংকটে পড়েছে এমন উদাহরণ আছে। শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি রুটে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ১০-১৫ মিনিট অন্তর বাস চলছে। জলপাইগুড়ি ডিপো এখন মাসে ১০-১২ লক্ষ টাকা লাভ করছে। অধিকাংশ ডিপোই আর্থিক দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে।

পুরনো জমানার স্টেট ট্রান্সপোর্টের আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল ট্রেলার বাস। একটা ছিল ইঞ্জিনসহ বাস, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত ইঞ্জিন ছাড়া একটা বাস। তাকে বলা হত ট্রেলার বাস। চলত কোচবিহার-দিনহাটা রুটে।

বিশ বছর আগে শুধুমাত্র শহর এলাকায় একটা নির্দিষ্ট স্থানে ভাড়ার ট্যাক্সির জন্য স্ট্যান্ড ছিল। সব গাড়িই প্রায় অ্যাম্বাসাডর, দু'-একটা ফিয়াট। এখন রাস্তার ধারে প্রতিটি বন্দরে একটা করে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। ৮০ শতাংশের বেশি গাড়ির প্রাইভেট নম্বর অর্থাৎ আইনত ওই গাড়ি ভাড়া দেওয়াই যায় না। নান ব্র্যান্ডের, নানা রঙের এবং নানা আকারের গাড়ির ভিড় ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। ইতিমধ্যে পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকায় নিত্যনতুন টুরিস্ট স্পট তৈরি হচ্ছে। ডুয়ার্সের গোরুমারা, লাটাগুড়ি, ঝালং, সামসিং, জলদাপাড়া, চিলাপাতাসহ বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন জায়গায় রিসর্ট, হোটেল, হোমস্টে ইত্যাদিতে এখন সারাটা বছর পর্যটকদের আনাগোনা। সঙ্গে বাড়ছে ভাল গাড়ির চাহিদা। সিকিম ও ভুটানের পর্যটনের একটা বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রিত হয় তরাই ও ডুয়ার্স থেকে। পর্যটকদের ছোট

গাড়ির চাহিদা এ ক্ষেত্রে বিপুল।

শিলিগুড়ির একটি পর্যটক পরিবহণকারী গাড়ির চালক নারদ লামা বলছিলেন, শুধুমাত্র দার্জিলিং জেলায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার মানুষ পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। টেলিফোন বুথ নেই, কিন্তু পেট্রোল পাম্পের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে। অর্থাৎ পরিবহণ ব্যবসা ঊর্ধ্বগামী।

কালের নিয়মে গোরুর গাড়ি হারিয়ে গিয়েছে। রিকশা আজকাল খুব কম, তার জায়গা দখল করে নিয়েছে ব্যাটারিচালিত ছোট্ট ছিমছাম টোটো গাড়ি। কেউ বলে টুকটুক। দাম প্রায় এক লাখ। কোনও লাইসেন্স নেই, রেজিস্ট্রেশন নম্বর নেই— অবাধে টোটো চলছে।

কয়েকদিন আগে গোরুমারা জঙ্গলের গভীরে দেখি এক মহিলা ও শিশু নিয়ে এক টোটোচালক চলেছেন নাগরাকাটার পথে। শিহরিত হলাম। কী অবিশ্বাস্য সাহস! ওঁর নাম হামিদুল। এর পর বেড়াতে গেলে ৭৩১৯৫৬৯৭৭৫ নম্বরে ফোন করে টোটোয় চেপে গোরুমারার গভীরে সফর করে আসতে পারেন। তবে তার সব দায়দায়িত্ব আপনার— আমাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না প্লিজ।

অটো এবং টোটো নিয়ে অনেক কথা আছে, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে অবশ্যই লিখব।

ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে সফল সপ্তম বর্ষ কালজানি নাট্য উৎসব

আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম নাট্যদল সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থার সপ্তম বর্ষ কালজানি নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১ থেকে ৫ এপ্রিল মায়া টকিজের স্বাধীনতা সংগ্রামী ননী ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চে। ১ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে 'নাটকের জন্য হাঁটুন' শীর্ষক শোভাযাত্রা। পাঁচ দিনব্যাপী নাট্য উৎসবে দক্ষিণবঙ্গের বেহালা ব্রাত্যজন, তিলজলা ঋতু, রানিকুঠির আঙ্গিক এবং উত্তরবঙ্গের গাজল বিষাণ, ইঙ্গিত (শিলিগুড়ি), থিয়েটার ইউনিট (শিলিগুড়ি), রূপায়ণ (জলপাইগুড়ি), দর্পণ নাট্য সংস্থা (জলপাইগুড়ি), গিলোটিন (মাথাভাঙা), বর্ণনা (কোচবিহার), ব্রাত্য সেনা (কোচবিহার), মাল অ্যাক্টোওয়ালা (মালবাজার), অনাসৃষ্টি (কোচবিহার) এবং সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থা (আলিপুরদুয়ার) অংশগ্রহণ করেছিল।

১ এপ্রিল উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় অতিরিক্ত জেলা জজ অশোককুমার পাল। উপস্থিত ছিলেন থার্ড কোর্টের বিচারক রুদ্রপ্রসাদ রায়, নাট্যব্যক্তিত্ব অলোক ভট্টাচার্য ও সভাপতি নির্মল দাস।

প্রথম দিন বর্ণনা (কোচবিহার) মঞ্চস্থ করে বিদ্যুৎ পাল নির্দেশিত নাটক 'এই করেছ ভাল'। গল্প ও অভিনয়ে দর্শককুল খুশি। ইঙ্গিত (শিলিগুড়ি) উপহার দেয় আনন্দ ভট্টাচার্য নির্দেশিত নাটক 'আপনজন'। শেষ নাটক বিষাণ গাজল (মালদহ) নিবেদিত, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত বহুচর্চিত নাটক 'সেথুঁয়া', যা বর্তমান সময়ে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। অভিনয় ও দলগত প্রচেষ্টায় নাটকটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক মাল অ্যাক্টওয়ালা নিবেদিত, সুধাংশু বিশ্বাস পরিচালিত 'বিরতির পর'। নাটকটির গল্প ভাল হলেও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেকটাই খামতি রয়েছে। দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় নাটক মাথাভাঙা গিলোটিন প্রযোজিত, নারায়ণ সাহা নির্দেশিত 'ডেথ সার্টিফিকেট'। নাটকটির গল্প, দলগত অভিনয় ও সময়কাল যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় নাটক রূপায়ণ (জলপাইগুড়ি) নিবেদিত, দীপঙ্কর রায় নির্দেশিত 'হীরামন'। দলগত প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।

তৃতীয় দিনে পরপর তিনটি অণুনাটক পরিবেশিত হয়। তার মধ্যে থিয়েটার ইউনিট

(শিলিগুড়ি) পরিবেশন করে কুন্তল ঘোষ নির্দেশিত নাটক 'শেষ অঙ্কে এসে'। নাটকটিতে একক অভিনয় করেন স্বাতী চাকী। দর্শকদের মতে, তিনি বেশ মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া দর্পণ নাট্য সংস্থা (জলপাইগুড়ি) প্রযোজিত, বীণা ভারতী নির্দেশিত নাটক 'নিষ্পত্তি' চলনসই। অনাসৃষ্টি (কোচবিহার) প্রযোজিত নাটক 'ইমাজিন দেয়ার ইজ নো ওয়ার'। সমগ্র অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থা প্রযোজিত, সিন্টু দত্ত নির্দেশিত নাটক 'সাকিন'। দর্শকদের প্রচুর ভালবাসা ও আশীর্বাদ কুড়িয়েছেন 'সাকিন' নাটকের কুশীলবরা। এই দিনটি ছিল ঝড়জলের রাত, তবুও আসনসংখ্যা ছিল কানায় কানায় ভরতি।

চতুর্থ দিনের মঞ্চের নামকরণ করা হয় সদ্যপ্রয়াত সংগীতশিল্পী ও শিক্ষিকা শুক্লা রায় সরকারের নামে। প্রথম নাটক উপস্থিত করে দক্ষিণবঙ্গের রানিকুঠির আঙ্গিক। আঙ্গিক-এর নিবেদন সুশান্ত মজুমদার নির্দেশিত বহুচর্চিত নাটক 'জীয়ন কন্যা'। দর্শকদের মতে, প্রযোজনার প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হওয়া দরকার। দ্বিতীয় নাটক কোচবিহার ব্রাত্য সেনা প্রযোজিত, তমোজিৎ রায় নির্দেশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চণ্ডালিকা' অবলম্বনে 'অচ্ছুত'। নাটকটি বেশ মন কাড়ে। কিন্তু সমস্ত নাটকটি হিন্দিতে উপস্থাপিত করার পর নাটকের শেষ গানটি কেন বাংলায় করা হল তা প্রশ্নের দাবি রাখে। তৃতীয় নাটকটি পরিবেশন করে তিলজলা ঋতু। জয়ন্তদীপ চক্রবর্তী নির্দেশিত ব্যতিক্রমী নাটক 'অদ্ভুত' দর্শকদের ভীষণভাবে মন কাড়ে। তবে নাটকটি যেহেতু রূপক, সেখানে বাস্তব চরিত্র না দেখালেও হত। নাটকের গল্প, কোরিয়োগ্রাফ, কম্পোজিশন দর্শকদের মন কেড়েছে। এই সময়ে নির্দেশক নাটকটি বেছে বেশ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চম তথা শেষ দিন সন্ধে ছ'টা থেকে মঞ্চে বেজে ওঠে সুমধুর সেতারবাদন। যখন দর্শকবৃন্দ মঞ্চে প্রবেশ করছেন নাটক দেখবেন বলে, ঠিক তখন শিল্পী-ডাক্তার মেঘনাদ ভৌমিক শাস্ত্রীয় সংগীতের উপর সেতার বাজিয়ে দর্শকদের মন ভরিয়ে দেন। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন মণিশংকর বিশ্বাস। ঠিক ৭টা ১৫ মিনিটে শুরু হয় দর্শকদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নাটক, বেহালা ব্রাত্যজন প্রযোজিত, সুপ্রিয় চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক 'সওদা'। উইলিয়াম শেকসপিয়রের 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে নাটক 'সওদা'। সালেক আলি মহম্মদ (শাইলক)-এর ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা দেবশংকর হালদার এবং মিস প্রিয়া (পোতিয়া)-র ভূমিকায় সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয় বহুদিন মনে রাখবেন দর্শক। কিন্তু দলের অন্য কুশীলবদের অভিনয় খুব একটা মনে দাগ কাটেনি। দর্শকদের মতে, এবারের কালজানি নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণকারী জেলার দল দক্ষিণবঙ্গের নাট্যদলের থেকে এগিয়ে রয়েছে। সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থার সম্পাদক পরিতোষ সাহা এবং নাট্য পরিচালক সিন্টু দত্ত বলেন, 'এ বছরের বাড়তি পাওনা হল দর্শকের হলমুখী হওয়া। আলিপুরদুয়ার পৌরসভা, প্রেরণা মুক্ত সাংস্কৃতিক সংস্থা, জেলা প্রশাসনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য।' সপ্তম বর্ষ কালজানি নাট্য সম্মান তুলে দেওয়া হল কোচবিহার জেলার দিনহাটার নাট্যকর্মী তপন সাহা এবং আলিপুরদুয়ার জংশনের বাসু দত্তকে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

অনিবার্য কারণবশত এই সংখ্যায় 'শ্রীমতী ডুয়ার্স' বিভাগ থাকছে না, তার জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {18.9cm (W) X 27.07 cm (H)}, Non Bleed {15.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {15.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {7.5 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {4.8cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 15.5 cm (W) X 5.2 cm (H), 1/4 Page 7.5 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {4.8 cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2017 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

প্রদীপ জ্বালিয়ে আড্ডাঘর ক্লাবের উদ্বোধন করলেন দেবপ্রসাদ রায়

শুরু হল আড্ডাঘর ক্লাব

১ লা বৈশাখে জলপাইগুড়ি তথা ডুয়ার্সের সুপরিচিত 'আড্ডাঘর' হয়ে গেল 'ক্লাব'। সদস্যদের একটি কমিটি ওই দিন থেকে আড্ডাঘর ক্লাবের পরিচালনার ভার তুলে নিল নিজের হাতে। 'এখন ডুয়ার্স' যেমন পাশে ছিল, তেমনই থাকল।

বিকেল সোয়া পাঁচটায় আড্ডাঘর ক্লাবের সদস্য হিসেবে দেবপ্রসাদ রায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ক্লাবের উদ্বোধন করলেন। নিয়ম অনুযায়ী আড্ডাঘরের সদস্যরা নিজেদের পারিবারিক অনুষ্ঠান ক্লাবে পালন করতে পারেন। তাই দু-জনের জন্মদিন পালন হল। স্কুল পড়ুয়া পাভেল আর অদ্রিজার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেলুন দিয়ে সাজান হয়েছিল আড্ডাঘর। জন্মদিনের কেক সহ ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত সদস্য এবং তাঁদের পরিজনদের দেওয়া হল চা-মিষ্টি ও 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার এপ্রিলের দুটি সংখ্যা। সদস্যরা বিনামূল্যে এই পত্রিকা পাবেন। ইতিমধ্যে 'এখন ডুয়ার্স'-এর ব্যুরো প্রধান 'আড্ডাঘর ক্লাব' কী কেন বিষয়ক বক্তব্য রেখেছেন।

দেবপ্রসাদ রায় তাঁর বক্তব্যে এই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, 'আড্ডাঘর' সম্ভবতঃ মহিলারা দখল করে নেবেন। কারণ সদস্যদের সিংহভাগ হলেন শ্রীমতি। উল্লেখ্য যে, আড্ডাঘর ক্লাবের মহিলা সদস্যরা 'শ্রীমতি ডুয়ার্স' ক্লাব খুলে মহা ফুর্তি করছেন। এদিনের উদ্বোধনের হাজারো ঝক্কি তাঁরাই সামলেছিলেন। দেবপ্রসাদবাবু প্রচ্ছন্ন থাকা 'এখন ডুয়ার্স'-এর সম্পাদককে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর বক্তব্যে।

এ ছাড়াও ছিল গান। শেষে 'ঋ' ব্যান্ডের সদস্যরা গান গেয়েছিল। তাঁদের কেউ কেউ আড্ডাঘর-এর সদস্য। 'আড্ডাঘর ক্লাব'-এ আড্ডা দেওয়ার জন্য সদস্যরা সপরিবারে অনেক সুবিধে পাবেন বলে সভাপতি জানিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রেরণার বর্ষবরণ

আলিপুরদুয়ার জংশনের প্রেরণা মুক্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। আজ পয়লা বৈশাখে ভোরের আলো ফোটার আগে কচিকাঁচা শিল্পীদের নিয়ে মেতে উঠল প্রেরণার আট থেকে আশি সকল সদস্য-সদস্যা। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংস্থার সভাপতি বিমল দেবরায়।

ডুয়ার্সের বিশিষ্ট লোক-গবেষক প্রমোদ নাথের দু'টি বই 'এক আকাশ অনেক মানুষ' ও 'উত্তরবঙ্গের নানা দিগন্ত'— প্রকাশ করেন ডিআরএম সঞ্জীব কিশোর। এরপর প্রেরণার দেওয়াল পত্রিকার উদ্‌বোধন হয়।

ছিল বিভাস ব্যানার্জির সংগীত। রিদ্‌ম ডান্স অ্যাকাডেমি সমবেত সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান উপহার দেয়। এ ছাড়া সংগীতে অংশ নেন— প্রতীপ ঘটক, স্বপন সিংহরায়, চন্দন রায়, ভবতোষ রায়, শুভ্রাদেব রায়, শম্পা চৌধুরী, প্রতিমা চাকি, মিলি চক্রবর্তী, পূরবী রায়, স্বপ্না মণ্ডল, বাবুজি অধিকারী, দেবাশিস ভট্টাচার্য প্রমুখ। আজকের অনুষ্ঠান মাত করে দেয় শহরের নতুন নাচের স্কুল মোহর ডান্স অ্যাকাডেমির শিশুশিল্পীরা। এরা হল যথাক্রমে— অনিন্দিতা ভদ্র, ঈশানী কর, অনুষ্কা কুণ্ডু, অস্মিতা কুণ্ডু, উর্জিতা চৌধুরী, আইভি চন্দ, সাহাজানা রায়। শিক্ষিকা মোহর সরকার জানালেন, সবে শুরু, এখনও অনেকটা পথ বাকি। অভিভাবকদের আশা, শহরের শিশুরা একজন নৃত্যশিক্ষিকা পেল। অনেককেই বলতে শোনা গেল, এগিয়ে চলো মোহর। আমরা তোমার পাশে আছি। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বিপ্লব মজুমদার ও সসীম নন্দী জানালেন, প্রতি বছর আমরা শুধু বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করেই শেষ করি না। বছরে চারটি অনুষ্ঠান তো করিই। এ দিনের অনুষ্ঠানে দর্শকাসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কঙ্ক মুখার্জি ও মোহর সরকার।

নিজস্ব প্রতিনিধি

শত কৃতীর আলোয় উজ্জ্বল দিনহাটার প্রাচীনতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে বেহার রাজ্যে (কোচবিহার) মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ ও দিনহাটায় একটি করে মোট তিনটি এমই স্কুল (ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত) চালু করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয় পরিদর্শক কে ডি বাগচি তাঁর ভিজিটর বুক-এ উল্লেখ করেছিলেন যে, সেই সময় এই বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজি স্কুল পাশাপাশি চলত। বিদ্যালয়ে একজন হেডমাস্টার ও একজন হেডপণ্ডিত ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের ভিত্তি বছর ধরা হয় ১৮৯০ সালটিকে। কারণ এই বছরেই প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রদের প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমোদন দেয়। ভিজিটর বুক থেকে আরও জানা যায়, ১৮৯০ সালে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১১। ১৯১০ সালে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪১। ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন রমণীমোহন বসু।

একটি নদীর যেমন অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাঁক থাকে, ঠিক তেমনই ১৯১৫ সাল দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। এই বছর মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর নিজে উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের উত্তর দিকের টিনের ছাদযুক্ত ঘরগুলো ছাত্রদের জন্য উন্মোচন করেছিলেন। আজও বিদ্যালয়ের ওই ঘরগুলোর দেওয়ালের ফলকে লিপিবদ্ধ আছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের উদ্দেশ্যে ছাত্র আসা শুরু হয় অবিভক্ত বাংলার রংপুরসহ সমগ্র কোচবিহার রাজ্য থেকেই। তাই তো ছাত্রদের প্রয়োজনেই সময়ের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল থাকার ব্যবস্থা, যা বোর্ডিং নামে পরিচিত। আপামর জনগণের কাছে বোর্ডিং আর বোর্ডিং-এর মাঠ বলতে দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের বোর্ডিংকেই বোঝায়।

ছয়ের দশক যেন দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের কাছে শৈশব ও কৈশোরকে অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণের সময়। একদিকে উত্তাল জনপদ অতিক্রম করে ইতিহাস আড়মোড়া ভেঙে বাঁক নিচ্ছে, ঠিক সেই সময় এই বিদ্যালয়কে যেন নতুন করে গড়ছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সর্বজনশ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি তাঁর সহকারী শিক্ষকদের সহযোগিতায় মনের মতো করে গড়লেন একঝাঁক তরুণ

ছাত্রদলকে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কমলকান্তি গুহ। যিনি উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রিত্বও সামলেছেন তিনি। একই সময়ে দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন হোসেন মহম্মদ এরশাদ, যিনি একসময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। এ ছাড়াও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন ডাঃ ফজলে হক, যিনি রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। এ ছাড়াও বহু কৃতী ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন, যাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য আমানুল্লা আহমেদ, বিশিষ্ট লোকসংগীতশিল্পী সুনীল দাস, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ প্রসেনজিৎ বর্মণ দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন।

বিদ্যালয় যখন প্রবহমান নদীর মতো চলছে, ঠিক সেই সময় ছাত্রছাত্রীরা পেল আচার্যপ্রতিম বেশ কয়েকজন শিক্ষককে— বাংলায় সুভাষ বাগ, বিমানবিহারী মৈত্র, ইংরেজি শিক্ষক উদয় মুন্সি, বিজ্ঞানে অখিলচন্দ্র মিত্র, আশুতোষ সিনহা প্রমুখ। সর্বক্ষেত্রে পঠন থেকে শুরু করে খেলাধুলো, এমনকি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জেলা নয়, রাজ্যব্যাপী ছাপ রাখতে শুরু করেছে এই বিদ্যালয়।

২০০১ সালে এই বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে শুভাশিস সাহা। তাকে সংবর্ধনা জানাতে রাজ্যের তৎকালীন

প্রধান শিক্ষক রতন অধিকারী

> কৃতী ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কমলকান্তি গুহ। যিনি বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যে। রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রিত্বও সামলেছেন। একই সময়ে ছাত্র ছিলেন হোসেন মহম্মদ এরশাদ, যিনি একসময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ে এসেছিলেন। এর পর ২০০৯ সালে মাধ্যমিকে চতুর্থ এবং ২০১১ সালে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হয়ে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সৌমেন সাহা রাজ্যবাসীকে জানিয়ে দিল, উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকায় থেকেও পরপর ভাল ফল করা যায়। একই বছরে রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিকে দশম হল বিদ্যালয়ের আরও এক ছাত্র জয় সাহা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র কনক সাহা 'নাসা'তে গবেষণা শেষ করে বর্তমানে ভারতের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সায়নদীপ ঘোষ ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটে গবেষণারত। বিদ্যালয়ের ছাত্র মানবেন্দ্র রায় গৌহাটি আইআইটি-র অধ্যাপক। এ ছাড়াও এই বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রর কেউ চিকিৎসক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ দার্শনিক, আবার কেউ বা খেলোয়াড়।

১৮৯০ সালকে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বর্ষ ধরে ২০১৫ সালে পালিত হল বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন। বৎসরব্যাপী পালিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রাক্তনীদের মিলন উৎসব যেন প্রকৃতপক্ষেই পুণ্যার্থীদের তীর্থক্ষেত্রে পুনর্মিলনে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতন অধিকারী, সহকারী শিক্ষক জয়ন্ত চক্রবর্তী প্রমুখ জানান, বর্তমানে দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ুয়াসংখ্যা ২২০০। স্থায়ী শিক্ষক ৩২ জন ও পার্শ্বশিক্ষক ৩ জন। স্থায়ী শিক্ষাকর্মী ২ জন এবং অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী ৩ জন। বেশ কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পদ শূন্য। তাঁদের বক্তব্য, সময়ের চাহিদা মেটাতে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি চালু হয়েছে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও। এ ছাড়াও বিদ্যালয়ে রয়েছে একটি এনসিসি ট্রুপ। বিদ্যালয়ের এই এনসিসি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয় আজও সমান তালে এগিয়ে চলেছে। আজকের কচিকাঁচাদের কলরবমুখর এক বিদ্যায়তনের পশ্চাৎপটে বহুকালের কত ছায়াছবি! ধূসর অতীতে প্রতিষ্ঠা। তারপর প্রবহমান নদীর মতো কত পথ অতিক্রম করে সমুদ্রের কাছে প্রণত হবার প্রত্যয়। দৈনন্দিনের চলমানতার ইতিহাস থেকে কিছু নুড়িখণ্ড কুড়িয়ে নিয়ে আজও এগিয়ে চলেছে দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়।

হরিপদ রায়

অরণ্য মিত্র

সুষমাকে তার খুনের কথা খুলে বলল মনামি। বাড়ির বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সুষমা তাকে এক অভিনব উপায় বলল। মনামিও জানাল তার অতীতের একটা টুকরো। নবেন্দু মল্লিকের কাছে এল পরিচিত সাংবাদিকের ফোন। অজানা সূত্র থেকে সে পেয়ে গিয়েছে গোপন এক সংবাদ, যা তাঁকে চরম সমস্যায় ফেলতে পারে। দেবমালা যাদবের মেইল পেয়ে কনক দত্ত নতুন দায়িত্ব দিলেন পরি ঘোষালকে। কিন্তু সে দিনই বিকেলে এল এমন এক সংবাদ, যা প্রমাণ করে দিল, কতটা সাংঘাতিক বুদ্ধ ব্যানার্জির দলবল। কী হল নবেন্দু মল্লিকের ?

৯১

সব শোনার পর সুষমা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। এবার সে মনামির দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুনটা তবে তোমার করা ? মাই গড ! এটা নিয়ে তো মিডিয়ায় প্রচুর হইচই হচ্ছে। কোনও ক্লু ছেড়ে আসোনি তো ?'

'এটা না করলে আমি ধরা পড়ে যেতাম। তোমরা সবাই ডুবতে !' মনামি হিসহিস করে বলল, '"ঋষিকাম" শিলিগুড়িতে বসে দেখা যাবে, সেটা তো আমরা জানতাম না !'

'এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট !' সুষমা সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে জানায়, 'কিন্তু তোমার জায়গায় আমি হলে কিছুই হত না। বরং কিছু কামিয়ে নিতাম। তোমার সমস্যা হল ফ্যামিলি। তোমার মা-বাবা সোসাইটির রেসপেক্টেড মেম্বার। তোমার বিরুদ্ধে প্রচারটা হাওয়ার মতো ছড়াত। সুইসাইড করতে হত তোমায়।'

'সেটা না করলে মেরেও দিতে পারতে তোমরা ?'

'তুমি খুব রেগে গিয়েছ !' সুষমা হাসল, 'তুমি কিন্তু কোনও ঝুঁকি নাওনি। তার বদলে সহজেই জীবনের প্রথম খুনটা করে ফেলেছ। এটা জানার পর আমরা তোমাকে সবরকম সাপোর্ট আর সিকিয়োরিটি দেব।' একটা ফ্লাস্ক থেকে কাপে গরম কফি ঢালল সে।

'আমি কিন্তু কোনও ক্লু রাখিনি।' কফিটা হাতে নিয়ে বলল মনামি, 'বাট আই হ্যাভ বিন ফিলিং টায়ার্ড আফটার দ্য কিলিং ! আই ওয়ান্ট টু গেট রিফ্রেশড। আমাকে কাজ দাও। অনলাইন সার্ভিসে আমার প্রোফাইল আবার চালু করো সুষমা। আমার কয়েকদিন রোজ কাস্টমার চাই।'

'তুমি জানলে খুশি হবে যে, ডুয়ার্সে আমাদের লোকজনেরা এক হয়ে যাচ্ছে। আমরা একটা স্বাধীন দলের আন্ডারে কাজ করব।' নিজের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলতে থাকে সুষমা, 'তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক প্ল্যান মনামি। তার জন্য তোমাকে বাইরে যেতে হবে। তুমি একটা বিয়ে করে ফেলো।'

'মানে ?' হতভম্ব হয়ে সুষমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মনামি।

'সাজানো বিয়ে।' সুষমা মিষ্টি করে হাসল, 'তুমি তাকে বিয়ে করে চলে যাচ্ছ বলে বাড়িতে জানিয়ে বেরিয়ে আসবে।'

'সেটা কিছু দিনের জন্য সম্ভব সুষমা। তারপর বাড়ির লোক মেনে নিলে আমি কী করব, সেটা ভেবেছ ?'

'তুমি যদি মুসলিমকে বিয়ে করো, তবে বোধহয় কোনও দিন সেটা ঘটবে না।' বিচিত্র হেসে বলল সুষমা, 'তোমার প্যারেন্টস খুব কনজার্ভেটিভ।'

'সেই মুসলিম ছেলেটা কে হবে ?' মনামি একটু ভেবে নিয়ে জানতে চাইল, 'আমরা থাকবই বা কোথায় ?'

'কোনও ছেলেরই দরকার হবে না। তুমি কেবল জানিয়ে দিয়ো, একজন মুসলিমকে বিয়ে

করেছ। তোমার কোনও খোঁজ যেন না করা হয়। থাকার জায়গা নিয়ে ভেবো না। কিন্তু সেটা শিলিগুড়িতে কোনওমতেই নয়।'

সুষমা এবার হাঁটতে হাঁটতে নিজের ফ্ল্যাটের ড্রয়িং রুমের জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। মনামি সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিল। তার দিকে একবার তাকাল সুষমা। এই মুহূর্তে মনামিকে দেখে মনেই হচ্ছে না যে, সে একটা খুন ঠান্ডা মাথায় করে ফেলেছে। সে বাঁচতে চায়। নিজের মতো বাঁচার তীব্র ইচ্ছে না থাকলে খুনটা করতে পারত না মনামি। অপরাধের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার কোনও ইচ্ছেই নেই তার। মা-বাবার বন্ধন থেকে একবার বেরিয়ে আসতে পারলে মনামি বহু দূর চলে যাবে।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কফির কাপটা খালি করে সুষমা আবার ধীরপায়ে এগিয়ে এল মনামির কাছে। তার মাথায় হাত রেখে বলল, 'কী ভাবছ? বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারবে?'

'আসতেই হবে।' সিলিং-এর থেকে চোখ না সরিয়েই মনামি উত্তর দিল, 'তোমাকে আজ একটা কথা বলব।'

'বলো।'

'হোয়েন আই ওয়াজ ফোর্টিন, সামওয়ান ট্রায়েড টু রেপ মি।'

'বাই এনি সিবলিং?'

'হুঁ। ডিসক্লোজ করলে আমাকেই দোষী ধরা হত। এটা আমাদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন। মেয়ে মানে একটা ভাল জামাই। এদের শিক্ষা দেওয়ার একটাই রাস্তা— খারাপ হয়ে যাও! ক্লাস নাইনে পড়তেই আই মেড ফার্স্ট লাভ। খারাপ হয়ে গেলাম।'

সুষমা কিছু বলল না। সব মেয়ের কাহিনিই বোধহয় কোথাও গিয়ে এক। কী-ই বা বলার থাকে সেখানে?

৯২

ফোনটা বাজছিল। নবেন্দু মল্লিক অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে সেটা তুলে ডিসপ্লের দিকে তাকালেন। 'দৈনিক ভোরবেলা' কাগজের সেই খচ্চর সাংবাদিকের ফোন। কন্যাসাথি এনজিও-র কাজকারবার নিয়ে তার কাগজে রোজ লেখা বার হচ্ছে। সে বিষয়ে তাঁকে দু'-একবার ফোনও করেছিল এই খচ্চর সাংবাদিকটি। অবশ্য গোলমেলে কোনও প্রশ্ন করেনি। নবেন্দু মল্লিক বুঝতে পারছেন যে, আর কয়েকটা দিন কেটে গেলে কন্যাসাথির এপিসোড ঝিমিয়ে যাবে। তারপর লোকে ভুলেও যাবে। তবে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে মানতেই হয়! কন্যাসাথির পুরো দলটাকে যেন ভ্যানিশ করে দিয়েছেন তিনি।

নবেন্দু মল্লিক ফোনটা কানে লাগিয়ে একটু বিরক্তির সুরে বললেন, 'হ্যাঁ, বলুন! সাতসকালে আমাকে না চাটলে তো আপনার পটি পরিষ্কার হয় না!'

'কী যে বলেন!' ওপার থেকে সাংবাদিকের হাসি শোনা গেল, 'কাল গভীর রাতে একটা ইনফর্মেশন পেয়েছি। তাই সকালে ফোন করলাম।'

'বলে ফেলুন।' বিছানা ছেড়ে নবেন্দু মল্লিক উঠলেন এবার, 'তবে সাতসকালে ফোন করার চাইতে রাত্তিরে করাটাই ভাল। আমি আড়াইটে-তিনটের আগে ঘুমাই না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' সাংবাদিক যেন একটু হাসলেন, 'তা কথাটা এবার বলি?'

'বলুন।' নবেন্দু মল্লিক একটা লম্বা সিগারেট ধরালেন।

'কন্যাসাথির সেই শুক্লা দাস, মানে যে আসলে কন্যাসাথি চালাত, তার সঙ্গে নাকি আপনার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল!'

পলকে আলস্য ঝেড়ে ফেলে নবেন্দু মল্লিক সতর্ক হলেন, 'যোগাযোগ কথাটা ঠিক নয়।' সাবধানি স্বরে বলতে লাগলেন তিনি, 'বাড়িটা আমার। ভাড়া দিয়েছিলাম। কিন্তু ভাড়া দিলেও তো নিজের সম্পত্তি সেটা, তাই মাঝে মাঝে যেতাম সেখানে। শুক্লা দাস আমাকে চা বানিয়ে খাওয়াতেন। এর বেশি কিছু নয়।'

'কিছু মনে করবেন না। সাংবাদিকদের অনেকরকম অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে হয়। আপনি নাকি তার সঙ্গে বেড়াতে-টেড়াতে যেতেন— একটা প্রাইভেট এজেন্সি এইরকমই দাবি করেছে।'

'এজেন্সি? কোথাকার এজেন্সি?'

'দুঃখিত। সোর্স বলা যাবে না। তবে আমরা শিয়োর না হয়ে এ নিয়ে কিছু লিখব না।' সাংবাদিক যেন অভয় দিলেন, 'আপনাকে জানিয়ে রাখি যে, একটা প্রাইভেট এজেন্সি শুক্লা দাসের সন্ধানে নেমেছে। তাদের সন্দেহ যে, শুক্লা দাস জলপাইগুড়ি টাউনে কোথাও আছে।'

'বালের কথা বলবেন না তো!' নবেন্দু মল্লিক এবার ধমক দিলেন, 'কন্যাসাথি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। এর মধ্যে পয়সা খরচা করে প্রাইভেট এজেন্সিকে কে কাজে লাগাবে?'

'রাগ করছেন কেন?' সাংবাদিকের নরম গলা শোনা গেল, 'আমার কাছে খবর আছে যে, সেই এজেন্সির লোক শুক্লা দাসের ছবি নিয়ে খোঁজখবর করছে। ডুয়ার্সের হোটেল আর রিসর্টগুলোতেও যাচ্ছে। একটা রিসর্টের মালিক স্বীকার করেছে যে, শুক্লা দাস এক যুবকের সঙ্গে তাদের ঘরে রাত কাটিয়েছিল। ছেলেটিকে তখন চিনতে না পারলেও রিসেন্টলি টিভিতে আপনাকে বাইট দিতে দেখে আইডেন্টিফাই করেছে।'

'শালা আমাকে ফাঁসাতে চাইছে!'

কথাটা তেমন জোরের সঙ্গে বলতে পারলেন না নবেন্দু মল্লিক। ঝানু সাংবাদিক সেটা অনুমান করে কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে বললেন, 'আসলে আপনার উত্থানটা সইতে পারছে না অনেকে! তবে আমি এসব নিয়ে কিছু লিখব না। আসলে আমি একটা সেমিনারে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছি। তাইল্যান্ডে। যাওয়া-আসার প্লেন ভাড়া জোগাড় করা নিয়েই দিন কাটছে। মনে হয় না যেতে পারব।'

'না না। যাবেন না কেন?' নবেন্দু মল্লিক এবার সহজ হলেন। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ফ্লাইটের জন্য কত লাগবে আপনার? সোর্সটা যদি ডিসক্লোজ করেন, তবে আমেরিকার ভাড়াও জোগাড় হয়ে যাবে!'

সাংবাদিক ও প্রান্তে মধুর হাসলেন। অজানা একটি নাম্বার থেকে কেউ তাঁকে ফোন করে জানিয়েছিল যে, কন্যাসাথির শুক্লা দাসকে তারা খুঁজছে। সে জলপাইগুড়িতেই আছে। তার সঙ্গে ফালাকাটার যুব নেতা নবেন্দু মল্লিক ডুয়ার্সের একটা রিসর্টে রাত কাটিয়েছিলেন। সাংবাদিকের ধারণা ছিল, কেউ রসিকতা করছে। কিন্তু নবেন্দু মল্লিকের সঙ্গে কথা বলার পর সেটাকে রসিকতা বলে মনে হচ্ছে না আর।

কিন্তু সেই নাম্বারটা এখনই দেওয়া যাবে না নবেন্দু মল্লিককে। ওটা হাতেই থাক।

৯৩

'প্রিয় কনকবাবু,
জলপাইগুড়িতে শুক্লা দাসকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে এখনও কোনও তথ্য না পেলেও আমাদের অনুসন্ধানী দল একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছে। তারা ডুয়ার্সের রিসর্ট এবং হোটেলগুলোয় শুক্লা দাসের ছবি নিয়ে খোঁজ চালিয়ে একটি রিসর্টে তার উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছে। শুক্লা দাসের সঙ্গে একজন পুরুষ ছিলেন। রিসর্টের মালিক পরে টিভি দেখে জেনেছেন যে, তাঁর নাম নবেন্দু মল্লিক। এটা কন্যাসাথি এনজিও পালিয়ে যাওয়ার কিছুদিন আগের কথা। উক্ত মল্লিক ফালাকাটা এলাকার জনৈক যুব নেতা।

আমার বিশ্বাস যে, নবেন্দু মল্লিকের গতিবিধি থেকে শুক্লা দাসের সন্ধান পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তিনি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন কি না, সেটা জানা জরুরি।

মল্লিকের পরিচিত এক সাংবাদিকের কানে খবরটা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যাতে বিষয়টা মল্লিক জানতে পারেন। অনুমান যে, জানার পর তিনি শুক্লা দাসের সঙ্গে দেখা করতে তৎপর হবেন। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক চাল।'

দেবমালা যাদবের লেখা ই-পত্র বার তিনেক পড়ার পর কনক দত্ত অপরিসীম এনার্জি অনুভব করলেন। সব ঘটনার সঙ্গে কোথাও নবেন্দু মল্লিকের একটা যোগাযোগ তিনি বারবার টের পাচ্ছিলেন। দেবমালার চিঠি সেটা নিশ্চিত করল। শুক্লা দাসের সঙ্গে রিসর্টে রাত কাটাবার অর্থ খুবই সরল। আশা করা যায়, শুক্লা দাসের শরীরের ভাঁজে নবেন্দু মল্লিকের মন এখনও আটকেই আছে। পুরুষমানুষের এ নেশা ভারী বিচিত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেরিয়ে আসতে পারে না। নারী শরীরের নেশায় জড়িয়ে অবিশ্বাস্য ক্রাইমের ঢের ঢের উদাহরণ তিনি দেখেছেন চাকরিজীবনে।

কনক দত্ত ফোন করলেন পরি ঘোষালকে। তিনি বেড়ালের খাদ্য কেনার জন্য বেরিয়েছিলেন। পশু হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে ফোনটা ধরে বললেন, 'কোনও খবর পায়নি বুঝলেন? শালাগুলো গুপ্তচর জগতের কলঙ্ক!'

'ওদের অন্য কাজ করতে হবে। দেবমালার মেইল এসেছে। শুক্লা দাস আর নবেন্দু মল্লিক একটা রিসর্টে রাত কাটিয়েছিল।'

'বলেন কী!?' বেড়ালের খাবার প্রায় পড়েই যাচ্ছিল হাত থেকে। সেটা সামলে পরি ঘোষাল রাস্তার ধারে চেপে এসে বললেন, 'তাহলে তো নবেন্দু মল্লিকের পিছনে ফেউ লাগাতে হয়!'

'বোঝাই যাচ্ছে, আপনি পুলিশি চিন্তায় অভ্যস্ত!' প্রশংসার সুরে বললেন কনক দত্ত, 'আপনার লোককে বলুন নবেন্দু মল্লিকের খবর রাখতে। তাঁর ড্রাইভারের সঙ্গে ভাব জমাতে পারলেই হবে। মল্লিক জলপাইগুড়ি যাবে কি না, সেই খবরটাই চাই।'

'ঠিক ঠিক! আপনি জলপাইগুড়ি চলে আসুন না কাল! '

কনক দত্ত সম্মত হলেন। পরি ঘোষাল উৎফুল্ল মনে হাঁটতে লাগলেন। নিজের ঘরে পৌঁছে বেড়ালের ভোজন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন কিছুক্ষণ। চা খেলেন। কাগজ আর পত্রিকা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলেন। গ্রীষ্মের বিকেল গড়াতে লাগল। একসময় পরি ঘোষাল বুঝলেন, কোনও একটা মিছিল আসছে। জানলা দিয়ে কৌতূহলে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, একটা রাজনৈতিক দলের মিছিল কিছুটা এলোমেলোভাবে এগিয়ে আসছে পথ বেয়ে। মিছিল থেকে 'অমর রহে' কথাটা সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও বাকি কথাগুলো আবছা শোনাচ্ছিল। জানলার নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় স্লোগানের মুখটি কানে এল তাঁর।

'ডুয়ার্সের যুব নেতা নবেন্দু মল্লিক অমর রহে!'

কয়েক সেকেন্ড নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না পরি ঘোষাল। সংবিৎ ফিরতেই চালু করলেন টিভি। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিউজ চ্যানেলের পাঠিকার গলায় শোনা গেল প্রার্থিত সংবাদ। ঘণ্টাখানেক আগে ফালাকাটা থেকে জলপাইগুড়ি আসার পথে তিস্তা ব্রিজের কাছে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন যুব নেতা নবেন্দু মল্লিক। দলের ঝান্ডা লাগানো মোটরসাইকেলে দু'টি যুবক ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা হাত দেখালে দলের কর্মী ভেবে যুব নেতা গাড়ি থামান। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। ড্রাইভারকে আক্রমণ করেনি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান যে, কোনও দক্ষ পেশাদার অপরাধী কাজটা করেছে।

পরি ঘোষাল দিশেহারা হয়ে গেলেন। এবার তিনি বুঝতে পারছিলেন শুক্লা দাসের পিছনে থাকা লোকগুলোর ক্ষমতা। নবেন্দু মল্লিকের মতো একজন জনপ্রিয় যুব নেতাকে এভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা অত্যন্ত

একসময় পরি ঘোষাল বুঝলেন, কোনও একটা মিছিল আসছে। জানলা দিয়ে কৌতূহলে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, একটা রাজনৈতিক দলের মিছিল কিছুটা এলোমেলোভাবে এগিয়ে আসছে পথ বেয়ে। মিছিল থেকে 'অমর রহে' কথাটা সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও বাকি কথাগুলো আবছা শোনাচ্ছিল। জানলার নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় স্লোগানের মুখটি কানে এল তাঁর।
'ডুয়ার্সের যুব নেতা নবেন্দু মল্লিক অমর রহে!'

সংগঠিত একটি কাজ। তিনি নিশ্চিত যে, গুলি করে ছেলে দুটো খুব বেশি দূরে কোথাও লুকাবে না, কিন্তু তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না আর।

নবেন্দু মল্লিকের ড্রাইভারকে ওরা কিছু করেনি। টিভিতে তার বক্তব্য দেখানো শুরু হল। আতঙ্কিত মুখে একটি মাঝ-তিরিশের যুবক এলোমেলোভাবে যা বলল তা থেকে বোঝা গেল যে, পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো ছিল। পরের গাড়িটা ছিল অনেকটা দূরে। নদীতে ফোর লেনের সেতু তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিল অনেকে। সেখানে যন্ত্রপাতির শব্দে গুলির অল্প আওয়াজ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে ছেলে দুটো মোটরসাইকেল নিয়ে দোমোহানির দিকে চলে যাওয়ার পরেও খুব একটা কেউ টের পায়নি যে, গুলি চালিয়ে খুনের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তা ছাড়া ড্রাইভার নিজেও গাড়ি ছুটিয়েছিল জলপাইগুড়ি হাসপাতালের দিকে। বস্তুত, হাসপাতালে আসার পরেই খবরটা জানাজানি হয়।

ড্রাইভারের বক্তব্যটা সাজিয়ে নেওয়ার পর পরি ঘোষাল মনে মনে তারিফ করলেন অপরাধের। কোথাও কোনও ভুল নেই। জ্যাম-জট না থাকলে তিস্তা ব্রিজের দু'পাশ ফাঁকাই থাকে। মোটরসাইকেলে দলীয় পতাকা লাগিয়ে অপেক্ষা করাটাও সুচতুর পরিকল্পনার নমুনা। কিন্তু খবরটা কি ধূপগুড়িতে কনক দত্তর কানে গিয়েছে?

দু'বার রিং হতেই কনক দত্তর অবসন্ন গলা শোনা গেল, 'টিভি দেখে ফোন করছেন?'

'আপনি শুনেছেন?'

'মিনিট পনেরো হল। বউ কার ইন্টারভিউ দেখবে বলে টিভি খুলেছিল। তখনই জানলাম।'

'নাউ হোয়াট টু ডু দত্ত? শুক্লা দাস তো ফ্রি হয়ে গেল!'

'মরে যাওয়ার কারণে নবেন্দু মল্লিককে এখন অনেকেই চিনবে। লোক লাগিয়ে খবর নাও যে, তাঁকে টাউনের কেউ মাঝে মাঝে কোনও বিশেষ জায়গায় দেখত কি না। সমস্ত ফ্ল্যাটবাড়ির কেয়ারটেকারদের কাছে খবর নিতে হবে। শুক্লা দাস তোমার টাউনে কোনও না কোনও ফ্ল্যাটবাড়িতেই আছে। একা লুকিয়ে থাকার পক্ষে ওটাই বেস্ট।'

'রাইট!' পরি ঘোষাল বুঝলেন যে, ফ্ল্যাটবাড়িতে খোঁজ করাটা খুব একটা জটিল নয়। নবেন্দু মল্লিক মরে গিয়ে এই সুবিধেটা দিয়ে গেল। এবার তাঁকে চেনাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। যে ফ্ল্যাটে ঢুকেছে, সেই ফ্ল্যাটের প্রহরীর মনে পড়বে নিশ্চই!

অবশ্য তিনটে সমস্যাও আছে— পরি ঘোষাল চিন্তা করলেন। সব ফ্ল্যাটবাড়িতে দারোয়ান নেই এবং কন্যাসাথি এনজিও উঠে যাওয়ার পর হয়ত এই প্রথম শুক্লা দাসের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন নবেন্দু মল্লিক! তিন নম্বরটা অবশ্য বেশ জটিল ব্যাপার। পুলিশ ড্রাইভারকে জেরা করে জানতে পারে যে, নবেন্দু মল্লিক জলপাইগুড়ি শহরে যাচ্ছিলেন কোথায়! সেটা অনুমান করে শুক্লা দাস কি আর এ শহরে থাকার রিস্ক নেবে?

চিন্তার ধাক্কায় ক্লান্ত হয়ে পরি ঘোষাল ভাবলেন, একটু বিয়ার পান করবেন।

(ক্রমশ)

উতরাই তরাই

৪৬

কাঠ চেরাইকলের মালিক সত্যভূষণ দাশগুপ্তর উচ্চতা পাঁচ ফুটের একটু বেশি। মাজা রঙের লোকটির বয়স হিদারুর প্রায় কাছাকাছি। অপরিসীম কথা বলতে পারেন। স্বল্পবাক হিদারু এই কয়েক দিনের মধ্যেই অনেক কিছু জেনে ফেলেছে সেই কথা শুনে। সত্যবাবু বলেন বটে বেশি, তবে ফালতু বকেন না। ডুয়ার্সে কাঠ চেরাই করে বিক্রি করার ফন্দিটা তাঁকে দিয়েছিল ঢাকার এক সিভিল সার্জেন। তাঁর বন্ধু ম্যাকার্চার সাহেব আমগুড়ি চা-বাগানের ম্যানেজার। বন্ধুর আহ্বানে ডুয়ার্সে শিকার করার জন্য মাসখানেক কাটিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল এই ব্যবসার কথা। কিন্তু কেউ আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে জানেন না।

প্রস্তাবটা মনের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল সত্যবাবুর। তারপর এই চেরাইকল। প্রোডাকশন ক্ষমতা বেশি নয়। কিন্তু কাঠ যে সোনা, সেটা তিনি বুঝে গিয়েছেন। হিদারুকে পেয়ে তিনি হাতে চাঁদ পেয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল না, লেখাপড়া জানা কোনও বাঙালি যুবক এই পরিবেশে কাজের সন্ধানে আসবে। তাঁর আশা যে, হিদারুর পক্ষে জলপাইগুড়িটা চিরকাল বিপজ্জনক হয়ে থাকুক। কাঠ চেরাইয়ের কাজে নেমে হিদারু বড়লোক হয়ে যাক।

বর্ষার কারণে কাজের চাপ কম। বিকেলের দিকে কারখানার প্রাঙ্গণে মাদুর পেতে সত্যবাবুর গল্প শুনছিল হিদারু। গোকুল নাগ কেরোসিন স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করছেন। নিতাই পালকে এখন তাহেরদা বলে ডাকতে অভ্যস্ত হয়েছে হিদারু। কিন্তু সে তাকে বঙ্কিম বলেই ডাকে। বাইরে হাতি দাঁড় করিয়ে তাহের মাদুরে এসে বসেছেন একটু আগে। কাছের এক চা-বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গঙ্গা ব্যানার্জির আসবেন বলে জানিয়ে রেখেছিলেন। নতুন একরকম চা তাঁর ম্যানেজারকে পাঠিয়েছে ম্যাকার্চার সাহেব। তারই একটু নমুনা নিয়ে আসবেন তিনি। সেটা এই আসরে বসে পান করা হবে।

চা-পাতার পিছনে যে অনেক ব্যাপারস্যাপার থাকে, সেটা হিদারু এখানে না এলে ভাবতেই পারত না। চারপাশে বেশ কয়েকটা বাগান। বেশির ভাগই সাহেবদের। কাজের সূত্রে অনেক বাঙালি বাবু রয়েছেন। এঁদের সঙ্গে তাহের আর সত্যবাবুর ভাল যোগাযোগ আছে। অবসরে কাঠগোলায় এসে গপ্প করে যায়। কিন্তু এঁরা সকলেই জানেন যে, হিদারু ভাগ্যান্বেষণের

উদ্দেশ্যে এসেছে এখানে। আসল ঘটনা তাহের আর সত্যবাবুর বাইরে যায়নি।

এলাকায় অজানা কোনও মানুষের দেখা পেলে তার কথা পুলিশে জানিয়ে দেওয়ার একটা দায়িত্ব তাহেরের উপর দিয়ে রেখেছে স্থানীয় থানা। সেটা বেশ দূরে এবং চা-বাগানের নিজস্ব আইন থাকায় তাদের পক্ষে এই অরণ্য-পর্বতময় ভূমিতে নজরদারি চালানো খুব কঠিন। কিন্তু তাহের তাঁর এই দায়িত্বের ব্যাপারে গোড়া থেকেই উদাসীন হলেও তিনি কল্পনায় দেখতেন কোনও বিপ্লবীর লুকিয়ে থাকার ছবি। কল্পনায় সে বিপ্লবীকে পুলিশের নজর বাঁচিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা দেখে তৃপ্তি পেতেন। তাই হিদারুর আসল খবর জেনে মনে মনে খুব আনন্দ পেয়েছেন তিনি। তাঁরও ইচ্ছে যে, বঙ্কিম যেন কাঠের ব্যবসায় নেমে পড়ে।

হিদারু অবশ্য কিছুই ভাবেনি।

এক পর্ব চা-পানের পর হিদারু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, চায়ের পাতাগুলো তুলে নিয়ে যাওয়ার পর ফ্যাক্টরিতে কি সেঁকা হয়?'

প্রশ্নটা শুনে তাহের অট্টহাস্য করে সত্যবাবুকে বললেন, 'সে কী মশাই! আপনি এখনও বঙ্কিমকে টি প্রোডাকশন নিয়ে কিছু বলেননি?'

'কাঠের বাইরে আমি কিছু বলি নাকি?' সত্যবাবু হাসলেন, 'আমার সব এখন উডেন। উড ইজ গুড!'

'পুরো ব্যাপারটা তুমি ফ্যাক্টরিতে আমার সঙ্গে গিয়ে দেখে এসো বঙ্কিম।' তাহের বললেন, 'এখন তুমি একটু এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করতেই পারো। মনে হয় না আর এদিকে তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে।'

এখানে আসার পর হিদারু সে অর্থে বাইরে যায়নি। প্রস্তাবটা তার মনে ধরল। বিকেল পাঁচটার একটু আগে দেখা গেল, বাগানের পালকি চেপে গঙ্গা ব্যানার্জি গোলার দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি সাহেবদের মতোই উঁচু, লম্বা। গায়ের রং টকটকে ফরসা। জামা আর গ্যালেস দেওয়া হাফ প্যান্টের সঙ্গে মাথায় টুপি আর পায়ে জুতো। হাতে চামড়ার সুদৃশ্য কেস। প্রায় হুম-হাম করতে করতে মাদুরে বাবু হয়ে বসে হিদারুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিই তো হিদারুবাবু?'

হিদারু হেসে নমস্কার জানাল।

'খুব ভাল করেছেন এসে। লেগে পড়ুন।' মাদুরের উপর সিগারেটের টিন রেখে বললেন তিনি, 'সাহেবদের অনেক ভাল দিক আছে। চা-বাগান দেখলে সেটা বুঝবেন। কিছু একটা নিয়ে পড়লে সেটা করে তারপর থামে।'

সিগারেটে লম্বা লম্বা টান দিয়ে চামড়ার কেস থেকে একটা চকচকে রুপোলি প্যাকেট বার করলেন গঙ্গা ব্যানার্জি। খানিকটা রাংতায় কিছু একটা মুড়ে আনা হয়েছে। সত্যবাবু একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটাই সেই নতুন ধরনের চা নাকি?'

'ঠিক ধরেছেন।' গঙ্গা ব্যানার্জি মোড়কটা সাবধানে খুলতে শুরু করলেন, 'এই চায়ের জন্য আলাদা মেশিন দরকার। সেটা বিলেতে তৈরি হলেই বাজারে চলে আসবে এই চা। মেশিন বানাবার কাজে সাহায্য করার জন্য ম্যাকার্চার সাহেব লন্ডন চলে যাচ্ছেন।'

চা দেখে সবাই বেশ অবাক হল। এ চা মোটেই শুকনো গুটিয়ে যাওয়া পাতার মতো দেখতে নয়। হোমিয়োপ্যাথির গুলির মতো প্রায় কালো রঙের দানা। বালুর মতো ঝুরঝুর করে হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু লেগে থাকে না প্রায়। কিন্তু এটা যে চা তা গন্ধেই মালুম হচ্ছে। চা দেখতে গোকুল নাগও এগিয়ে এসেছিল। তার হাতে খানিকটা দানাদার চা দিয়ে গঙ্গা ব্যানার্জি বললেন, 'যেভাবে কালো চা বানাও, সেভাবেই টি-পটে দিয়ে গরম জল ঢেলে ঢেকে দাও।'

> এলাকায় অজানা কোনও মানুষের দেখা পেলে তার কথা পুলিশে জানিয়ে দেওয়ার একটা দায়িত্ব তাহেরের উপর দিয়ে রেখেছে স্থানীয় থানা। সেটা বেশ দূরে এবং চা-বাগানের নিজস্ব আইন থাকায় তাদের পক্ষে এই অরণ্য-পর্বতময় ভূমিতে নজরদারি চালানো খুব কঠিন।

'এ চায়ের নাম কী?' তাহের গলা শুনে বোঝা গেল, বিস্ময়টা তাঁর কাটেনি। চা-পাতার এমন দানাদার রূপ তাঁর কাছে বেশ বিচিত্র ঠেকছিল।

'সিটিসি।' গভীর তৃপ্তির সুরে বললেন গঙ্গা ব্যানার্জি, 'এ চা অল্পেই লিকার দেয়। দামও কম হবে অর্থোডক্স টি-এর তুলনায়। ভেবে দেখুন, দামের কারণে এখনও অনেক মানুষ চা খেতে পারে না। সিটিসি এলে তারা সবাই খাবে। ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছেন?'

'গ্রেট!' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর সত্যবাবু উচ্চারণ করলেন শব্দটা— 'এই চা ম্যাকার্চার সাহেবের আবিষ্কার?'

'পুরোটাই!' ধোঁয়ার গোল্লা ছুড়তে ছুড়তে গর্বের সুরে জানালেন তিনি, 'চা-পাতাকে ছোট ছোট করে কেটে কাজটা করেছেন। তামাকপাতা কাটার জন্য লেগ কাটিং মেশিন দেখেছেন? সে মেশিন তিনি লাগিয়েছিলেন চা-পাতা কাটার কাজে। এ চায়ের প্রত্যেকটা দানা হল এক কুচি পাতা।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি। গোকুল নাগের ভয়ার্ত কণ্ঠ থামিয়ে দিল তাঁকে। পট থেকে কাপে চায়ের লিকার ঢেলে সেদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে গোকুল নাগ।

'কী হল গোকুলবাবু?'

'টি-পটে কিছু ছিল!' সত্যবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন তিনি, 'এই দেখুন!'

একটা কাপ এগিয়ে দিল সে। কাপে বেশ খানিকটা গরম প্রায় কালো রঙের তরল পদার্থ। চায়ের ফুরফুরে সোনালি রঙের চিহ্নমাত্র নেই তাতে। কিন্তু গঙ্গা ব্যানার্জি প্রবল অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে, এটাই লিকার। দেখেছেন কেমন রং বেরিয়েছে। বেশি করে দুধ মেশান। চিনি ঢালুন।'

নিজেই উঠে কাপে চা ঢেলে গরম দুধ মিশিয়ে চিনি দিয়ে সকলের সামনে সাজিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার চুমুক দিন। বুঝবেন কী জিনিস!'

সত্যিই বাকি চারজন দুধ মেশানো ঘন ক্রিম রঙের চায়ে চুমুক দিয়ে শিহরিত হলেন। তারপর মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন ম্যাকার্চার সাহেবের গবেষণার কাহিনি। কীভাবে দিনের পর দিন অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে লেগে ছিলেন চা-পাতার কুচিকে কুঁকড়ে দানায় পরিণত করার জন্য। পাতা থেকে আরও বেশি লিকার বার করে আনাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

গল্পে গল্পে গড়িয়ে গেল আরও একটা বিকেল। ফুরিয়ে গেল দিন। ম্যাকার্চার সাহেব বিলেত চলে যাওয়ার আগে বন্ধুদের দিয়ে গিয়েছেন খানিকটা করে সিটিসি চা। তাঁর আমগুড়ি বাগানে একক চেষ্টায় তৈরি শেষ কয়েক কিলো চা। তাঁর হাতে তৈরি সিটিসি চায়ের এই শেষ দফাটাই ছিল সব চাইতে সেরা।

দু'দিন পর দেখা গেল, অরণ্যের দিকে হেঁটে চলেছে ওরা। গঙ্গা ব্যানার্জির হাতে রাইফেল। ওদের সঙ্গে কিছু মালপত্র আর খাবার নিয়ে চলেছে তিনজন কুলি। দেখে মনে হচ্ছিল যে, বড় কোনও শিকার যাত্রায় বেরিয়েছে তারা। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল হিদারুকে নিয়ে চারপাশে একটু বেরিয়ে আসা। বর্ষার জঙ্গলে শিকার জমে না। এক-আধটা হরিণ পেলে হয়ত গুলি চলতে পারে।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

মেঘ ডুবি ডুগডুগি

কাজের ঠেলায় ডুয়ার্সের ছেলে মুম্বইতে অডিয়ো স্টুডিয়োর ছাদে বসে মশার কামড় খাচ্ছে। ঘটে গিয়েছে বিচিত্র বৃহন্নলা সংবাদ। কিন্তু এর মধ্যে বাঙালের লটে মাছ আসে কোত্থেকে? আরডি বর্মনের গানও জড়িয়ে যায় কেন? কেনই বা লেখকের মনে হয় যে, ডুয়ার্স ছাড়িয়ে পাহাড়ের পথে উঠলে ড্রাইভাররা আরডি-র গানই চালিয়ে দেবে সাউন্ড সিস্টেমে? এসবের পাশাপাশি জলি মুখার্জি, শোলে, কুইকা— হরেক বিষয়ে লেখা এবং রেখায় দিব্যি সাজিয়ে ফেলেছেন লেখক, চমৎকার সরসতায়।

ভোরবেলায় মুম্বই পৌঁছে আমি আর সহকর্মী রাজু দাস একখানা অটো ধরলাম কুরলা জংশন থেকে। যে ডিরেক্টরের ছবির গান রেকর্ডিং হবে, তার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তখন অন্য একটি ছবির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজে মুম্বইতেই ছিল। আমাদের আনকোরা দু'টিকে অন্ধেরির কাছে একটা হোটেলের সন্ধান দিয়ে রেখেছিল সে। অটোওয়ালাকে সেই ঠিকানাই বলা হল।

এর পর অটো চলছে তো চলছেই। পথ আর শেষ হয় না। এক-একটা ট্রাফিক সিগন্যালে অটো দাঁড়িয়ে পড়ে, আর চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে বিকলাঙ্গ ভিখিরিরা, নয়ত বৃহন্নলাদের দল। সেরকম এক জায়গায় এক বলশালী বৃহন্নলা যথারীতি টাকা চাইছে, আর রাজু গম্ভীর মুখে লালমোহন গাঙ্গুলি ঢঙে 'চলো ভাগো ভাগো...' বলছে তাকে হাঁকাবার জন্য।

পরমুহূর্তে হঠাৎ এক প্রচণ্ড ঝটাপটি!

আমি দেখি, পলকের মধ্যে বৃহন্নলাটি রাজুর মুণ্ডু পুরো আঁচলের নিচে ঢেকে ফেলে সুর করে গাইছে, 'দে না রে বাবা... কুছ তো দে... ভগবান তেরা ভলা করেগা-আ-আ...' সে কী দৃশ্য! একদিকে হতভম্ব রাজুর আঁচল ঢাকা মুণ্ডুটি হাঁকুপাঁকু করছে সেই বিরাট আঁচলের ভাঁজ ফুঁড়ে বেরনোর তাগিদে, আরেক দিকে আঁচল পুঁটুলির গভীর থেকে নিঃসৃত হচ্ছে তার তীক্ষ্ণ চিৎকার— ধ্যাৎ শালা, ধ্যাৎ শালা, ধ্যাৎ শালা!

বন্ধুর এমনতর 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' দশা দেখে তো নিশ্চল থাকা যায় না! তো, যেহেতু ওর দু'টি হাত আঁচল লন্ডভন্ড করায় ব্যস্ত, অগত্যা তাই আমিই হাত বাড়িয়ে ওর বুকপকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করলাম ঝামেলা মেটাতে। বলাই বাহুল্য, সেটা হস্তগত হওয়ামাত্রই সেই বৃহৎ বৃহন্নলা ঠিক যেন ফুসমন্তরে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

অতঃপর, রাজু প্রথমে একটা বড় হাঁপ ছাড়ল। তারপর নিজের বুকপকেটে চোখ বুলিয়ে নিয়ে একযোগে ভুরু কুঁচকে এবং চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বন্ধুর মতো কাজ করলি না কিন্তু এটা!'

কী আর বলব। ভাল কাজের মর্ম লোকে সব সময় দেরিতে বোঝে! আমি দেখলাম এই পরিস্থিতিতে মন্তব্য নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

বাকি পথটা তাই চুপচাপ। তবে দু'জনেই সারাক্ষণ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে একদম সিটের মাঝবরাবর জমি কামড়ে রইলাম। সৌজন্য, মুম্বইয়ের ওই প্রথম শিক্ষা... আঁচল হইতে সাবধান!

ভাবনায় ছেদ পড়ল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এবং উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে...

জলি মুখার্জি আজ সন্ধেবেলায় ডাবিং করতে আসছে রে!

ঠোঁটে একখানা সিগারেট ঝুলিয়ে, রাজু প্রায় ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

মুখে তার বিজয়ীর হাসি।

অকুস্থল, আবার সেই সানা রেকর্ডিং স্টুডিয়োর ছাদ। খানিকক্ষণ আগেই যেখানে আমাদের লাঞ্চ শেষ হয়েছে। তার আগে আর পরে অবশ্য শুধু ভারাক্রান্ত অপেক্ষার প্রহর গোনা চলছিল। রাজুর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এখন বিকেল তিনটে বাজে। অর্থাৎ আমরা মুম্বই এসে পৌঁছানোর পাক্কা তিরিশ ঘণ্টা বাদে, এতক্ষণে সত্যি একটা বলার মতো সুসংবাদ মিলল!

আসলে, আর্টিস্টদের ব্যস্ত টাইম শিডিউলের দরুন তখনও অবধি এক লাইনও গান রেকর্ড হয়নি। অথচ স্টুডিয়োতে ঘণ্টাপ্রতি ভাড়ার মিটারটা রীতিমতো চালু। মুম্বইয়ের বড় বাজেটের পিকচার এই অতিরিক্ত খরচটা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে সেটাই আবার গায়ে লাগার মতো অপচয়। সুর-তালের ম্যাজিক দেখার প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম বটে। কিন্তু দেড় দিন কেটে গিয়েছে সারাক্ষণ এই খরচ সামলানোর অঙ্কবহুল কাষ্ঠহাসিতেই। অবশেষে, এবারে তাহলে প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে...

যা প্লেব্যাক সিঙ্গিং, স্টুডিয়োর পরিভাষায় তাকেই বলে ডাবিং। কারণ, যখন মিউজিক ট্র্যাক তৈরি করা হয়, তখন মিউজিক ডিরেক্টর হয় নিজের গলায়, নয়ত কোনও অনামী গায়কের গলায় গানের একটা খসড়া রেকর্ড করে রাখেন। বড় গায়করা এসে সেটার উপরে ভয়েস ডাব করে দিয়ে যান।

তবে অনেক বিখ্যাত গানের বেলায় কিন্তু দেখা গিয়েছে, এ নিয়মে কিছু অদলবদলও হয়ে যায়। যেমন 'শোলে' সিনেমার 'মেহবুবা' গানটি। আসলে নাকি হেলেনজির লিপে আশা ভোঁসলে ওটা গাইবেন বলে ঠিক ছিল। কিন্তু ট্র্যাক তৈরির সময় রাহুল দেববর্মন নিজের গলায় যে অসাধারণ গাইড ট্র্যাক গেয়েছিলেন, সেটা শোনার পর আশাজি কিছুতেই ডাবিং করতে রাজি হননি। তাঁর মতে, ওই গানে বর্মন সাহেবের কণ্ঠের কোনও বিকল্প হয় না। ফলে, রয়ে গেল গানটি পুরুষ কণ্ঠে। আর গানের দৃশ্যে হেলেনজির সঙ্গে যোগ হয়ে গেল জালাল আগার চরিত্রটি, গানে লিপ দেওয়ার প্রয়োজনে।

জলি মুখার্জির ডাবিং চলার ফাঁকে চলছিল একটা চায়ের ব্রেক। আর তখনই গল্প-আড্ডায় উঠে এল এইসব প্রসঙ্গ। ততক্ষণে এই রাশভারী প্রবীণ গায়ককে 'জলিদা' বলে ডাকার অনুমতি পেয়ে গিয়েছি আমরা।

—আমিও একটা ফিল্ম প্রোডিউস করছি, বুঝলি। ছবির নাম 'ডিটেকটিভ নানি'। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল জলিদা। আর আমাদের কোম্পানির নাম হল বম্বে ডাক ফিল্মস।

আরডি বর্মন যে গলায় গান গাইতেন, এক কথায় তা অননুকরণীয়। কিন্তু তার খুবই কাছ দিয়ে যায় জলি মুখার্জির গলা। 'দয়াবান' ছবিতে 'চাহে মেরি জান তু লে লে' কিংবা এআর রহমানের সুরে তাঁর গাওয়া 'মুকাবিলা' মনে পড়ে গেল। ছাত্রজীবনে গানগুলো শুনে আরডি-র গলা বলেই ভুল হয়েছিল প্রথমে। যদিও দ্বিতীয় গানটি রিলিজ হওয়ার কিছুদিন আগেই বোধহয় আরডি মারা গিয়েছিলেন!

বম্বে ডাক! শুনেই মনে হল, এ যে ডাক-নামে নামডাক হওয়ার প্রত্যাশা!

কারণ, ডাক বললে যদিও হাঁসের কথাই মনে আসে, আসলে কিন্তু বম্বে ডাক হল লটে মাছ। পূর্ববঙ্গের মানুষদের খুব প্রিয়। নর্থ বেঙ্গলে থাকতে আমি এ মাছ কখনও দেখিনি। তবে কলকাতার বাজারে খুব ওঠে।

জলিদাকে বললাম, আপনি কি বাঙাল নাকি দাদা? লটে মাছের নামে প্রোডাকশন ব্যানারের নাম দিয়েছেন?

জবাবে জলিদা বললেন, মাছটা বাঙালদের ফেভারিট হতে পারে ভাই। কিন্তু পাওয়া যায় আমাদের বম্বে উপকূলেই বেশি। এর নাম বম্বে ডাক কেন হল জানো?

সত্যিই এতদিন মনে প্রশ্নটা ছিল। একটা সাদা রঙের মাছকে ইংরেজিতে কেন বম্বে ডাক বলে? আজ উত্তরটা জানতে পেরে বুঝলাম, নামকরণ সত্যিই যুক্তিপূর্ণ। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববঙ্গের রসনার তৃপ্তি ঘটাতে এই মাছ নাকি টনে টনে ট্রেনে চাপিয়ে বম্বে থেকে বাংলায় পাঠানো হত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মাছের ভয়ানক গন্ধে নাকাল ট্রেনযাত্রীরা সে ব্যবস্থায় সাংঘাতিক আপত্তি জানানো শুরু করে। তখন শান্তি বজায় রাখতে, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের বদলে মাছ পাঠানো শুরু হয় 'বম্বে ডাক' নামক মেল ট্রেনে। ব্যাস! সেই মেল ট্রেনের নাম থেকে মাছের ইংরেজি নাম মিলে গেল!

আড্ডা জমাতে জুড়ি নেই জলিদার। লটে মাছের গল্প থেকে এর পর আমরা অবলীলায় চলে গেলাম আরডি বর্মনের 'মাছের কাঁটা' গানটি তৈরির গল্পে। সদ্য তখন ব্রাজিলের কার্নিভ্যাল দেখে বম্বে ফিরেছেন আরডি। আর পরের দিন সেখান থেকে খুঁজে আনা ল্যাটিন তালবাদ্য কুইকা নিয়ে হাজির হয়েছেন স্টুডিয়োতে। ভুভারতে তখনও এই বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। অথচ আরডি নাকি সেটা ফ্র্যাঙ্কো ভাজের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ঘণ্টাখানেক পরে রেকর্ডিং করব। তুমি যাও, তার মধ্যে চটপট শিখে নাও, কী করে বাজাতে হবে!

প্রথমে তো ফ্র্যাঙ্কোর আকাশ থেকে পড়ার দশা। কিন্তু আরডি বর্মনের টিমের মিউজিশিয়ান বলে কথা। এক্সপেরিমেন্ট করে ঠিক বার করলেন, কী করে যন্ত্রটির মুখে বুলি ফোটানো যায়। আর তারপরই সৃষ্টি হল 'মাছের কাঁটা' গানের সেই অদ্ভুত 'কুকু-কু-কুকু' ধ্বনির রিদ্‌ম প্যাটার্ন।

গল্প হয়ত এভাবেই চলতেই থাকত, যদি-না মিউজিক ডিরেক্টর অশোকদা এসে তাড়া লাগাতেন। অশোকদা এসে বললেন, জলিদা সেভেন্টি এইট থেকে পঞ্চমদার কোরাস টিমের ট্রেনার ছিলেন। তোমরা দু'মাস ধরে রোজ শুনলেও কিন্তু ওঁর পঞ্চমদার গল্পের স্টক ফুরাবে না!

এটা হল ভদ্রভাবে বলা, টি ব্রেক ইজ ওভার।

নিজের রসিকতাতে নিজেই হো হো করে হেসে উঠলেন জলিদা। তারপর গুনগুন করতে করতে ঢুকে পড়লেন রেকর্ডিং কেবিনের ভিতর। আমরা সবাই চলে এলাম রেকর্ডিস্টের রুমে। কাচের আড়াল থেকে দেখা গেল, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কানে হেডফোন পরছেন জলিদা।

এর পর অডিয়ো চেক দিতে গিয়ে প্রথমেই যে স্কেল আর টোনে গলা দিয়ে শব্দ বার করলেন, তাতে সারা গায়ে একদম কাঁটা দিয়ে উঠল।

এর কারণ অবশ্য দুটো। প্রথমত, অবশ্যই গায়কের গলার কারুকার্য। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সাউন্ড সিস্টেম ও মাইক্রোফোনের কথাও বলতে হবে। দশ লাখ টাকা দামের মাইক্রোফোন যে ডিজিটাল সাউন্ডটা পাঠাচ্ছে সাউন্ড বক্সে তা একদম মোক্ষম শব্দব্রহ্ম!

আরডি বর্মন যে গলায় গান গাইতেন, এক কথায় তা অননুকরণীয়। কিন্তু তার খুবই কাছ দিয়ে যায় জলি মুখার্জির গলা। 'দয়াবান' ছবিতে 'চাহে মেরি জান তু লে লে' কিংবা এআর রহমানের সুরে তাঁর গাওয়া 'মুকাবিলা' মনে পড়ে গেল। ছাত্রজীবনে গানগুলো শুনে আরডি-র গলা বলেই ভুল হয়েছিল প্রথমে। যদিও দ্বিতীয় গানটি রিলিজ হওয়ার কিছুদিন আগেই বোধহয় আরডি

মারা গিয়েছিলেন!

আসলে রাহুল দেববর্মনের গলায় গান অথচ হিট হয়নি, এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। আর কেন জানি না, উত্তরবঙ্গের দৃশ্যপটে তাঁর সুর মানেই এক আশ্চর্য মাদকতার জাদু। বিশেষত পাহাড় হলে তো একেবারে ‘মেড ফর ইচ আদার’। সেবক হয়ে পাহাড়ের পথে যখন গাড়ি ওঠে, তখন মিউজিক সিস্টেমে একবার আরডি-র যে কোনও গান চালিয়ে দেখুন! মনে হবে, ঠিক এই লোকেশনের কথা ভেবেই যেন গানটা তৈরি হয়েছিল। আমি তো প্রাইভেট ভাড়ার গাড়িতে ট্রাভেল করতে গিয়ে দেখেছি, মিউজিক চয়েসটা ড্রাইভারদের হাতে ছেড়ে দিলে বেশির ভাগ সময় ওরাও আরডি-র গানই বাজাতে পছন্দ করে, এখনও।

কুইকা, কাসানেটের মতো নানা বিদেশি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট। মিউজিশিয়ান কেসরি লর্ডকে দিয়ে নানা অদ্ভুত ইলেকট্রনিক সাউন্ড সৃষ্টি। প্রকাণ্ড মাটির কুঁজোর উপর ভেজা ঢাকের চামড়া বসিয়ে ‘পেডাল মটকা’ নামক বাদ্যযন্ত্র তৈরি। আর সর্বোপরি কণ্ঠ নিয়ে কারিকুরি। সত্যি, গ্রেট পঞ্চম একই সঙ্গে সুরকার আর সাউন্ড ডিজাইনারও যেন! গম্ভীর নিনাদে, মেঘে ডোবা ডুগডুগির ঝড় খুঁজতেই তাই যেন বারে বারে তাঁর ওই পুরনো গানগুলোর কাছে আজও ফিরে আসতে হয় বলিউড মিউজিককে। মেলডি আর রিদ্‌ম, দুটোর জন্যই।

কলকাতার মিউজিক ডিরেক্টর অশোক ভদ্র ঠিক ওই ধরনেরই সুর ও মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলেন ‘অগ্নি’ ছবির টাইটেল ট্র্যাকের জন্য। জলিদার পাওয়ারফুল গলা একদম মাপে মাপে জাস্টিস করল সেই গানের ছন্দে ও রাগী এক্সপ্রেশনে। আমাদের বাঙালি প্রোডাকশন হাউসটি তার ঠিক আগে আগেই একটি বড় বাজেটের আর্ট ফিল্মে লোকসান করে একদম খাদের কিনারে পৌঁছে গিয়েছিল। এই ছবিটি না চললে প্রোডাকশন হাউস বন্ধ হয়ে যাবে, এমন একটা অবস্থা তখন। তাই কোথাও যেন একটা হালকা ভয় কাজ করছিল কোম্পানির কর্মী, আমাদের দুই বন্ধুর মনেই। জলিদ তখন গাইছেন ‘ভয় কাকে বলে, তা সে জানে না... তার চোখে আগুন, সে কিছুই মানে না...’

আর সেই প্রথম গান রেকর্ডিং-এর অনুভূতিই কেন যেন বলে দিচ্ছিল যে, ‘অগ্নি’ হিট হবেই হবে! আর বাস্তবে হয়েছিলও তা-ই। এতটাই হিট হয়েছিল যে, প্রোডাকশন হাউসের জন্য পরের দশ বছরের অগ্রগতির রাস্তা সে প্রায় একাই গড়ে দিয়েছিল।

অভিজিৎ সরকার

(ক্রমশ)

পাঠকের পরিক্রমা

তিনবিঘা ও তার আশপাশে এক বিকেলে

ভারতের একমাত্র করিডর বলতে যার নাম বলতে হয়, সেই করিডর সম্পর্কে আগে বহুবার শুনেছি, কিন্তু যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। এবারে এক শনিবার বিকেলে ঘুরে এলাম বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের তিনবিঘা করিডর। অনেকেই অনেকবার ঘুরে এসেছেন, তাই নতুন করে বলার কিছু নেই। তবু যে কথা বলার তা হল, দুই বাংলার মানুষের আত্মার সম্পর্কটা অনুভব করলাম অদ্ভুতভাবে। কোনও দিন ওপার বাংলায় যাইনি, কিন্তু বাবার কাছে তাদের অতিথিপরায়ণতার বিষয়ে এতবার শুনেছি যে বলার নয়। কমান্ডার সাহেব আমাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন গল্প করতে করতে। সেই রাস্তা দিয়ে ওপারের গাড়িঘোড়া চলছে অবিরত, যাওয়ার সময় হাঁক দিচ্ছেন এপারের বাসিন্দাদের, ‘কী ভাইজান, কেমন আছেন?’ হাসি হাসি মুখের আদানপ্রদান চলতে থাকে শুধু। বড় ভাল লাগে সে দৃশ্য দেখতে। আমরা যেমন দেখতে গিয়েছি, তেমন ওপার থেকেও বাসিন্দারা ঘুরতে এসেছিলেন এদিকে। একই করিডর দিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। প্রথমে হাসি, তারপর গল্পে মেতে উঠলাম সকলে। কত্ত গল্প! এক দিদি ছিলেন নাম, তার হাসিনা বানু। বললেন, ‘কী খারাপ লাগে আমাদের, আমরা চাইলেও আপনাদের দিকে যাইতে পারি না, আর আপনারা চাইলেও আমাদের দিকে আসতে পারেন না! ভাল্লাগে না জানেন? যদি একটাই দেশ হইত!’

সত্যিই মিশে গেলাম আমরা একসঙ্গে সে দিন। গল্প জুড়লাম কত্তরকম, উঠল ইলিশের কথাও! মজা-ঠাট্টা করে সময় গড়িয়ে গেল বেশ খানিকটা। ওদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তাদের বাড়ি ফিরে আসছে, কিচিরমিচিরের শব্দে পাশের মানুষটির কথাও কানে আসে না। এমনইভাবে হাসিনাদিদি, জাহিদারাও বাড়ি ফিরে গেল, রেখে গেল কিছুটা ভাল মুহূর্ত। গেটের এপার থেকে আমরা হাত নাড়তে থাকলাম, ওরাও বারে বারে পিছনে ফিরে তাকাচ্ছিল যতক্ষণ দেখা যায়! অবশেষে আড়ালে হারিয়ে গেল। আর হয়ত কোনও দিন ওদের সঙ্গে দেখা হবে না এ জীবনে। কিছু সময় শূন্য রাস্তার দিকে তাকিয়ে ফেরার পথ ধরলাম, আবার

তিনবিঘা পেরিয়ে আরও ১৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর এই ক্যাম্প। শুরু হওয়ার বেশ খানিকটা আগে থেকেই দেখছি সশস্ত্র বাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি চতুর্দিকে, কেউ কেউ সরকারি গাড়িকে সংবর্ধনাসূচক স্যালুট দিচ্ছেন। নিরাপত্তা দিচ্ছেন।

রওনা হলাম কমান্ডান্ট এস রাঠোরের নিমন্ত্রণে হেমন্ত বিওপি-র উদ্দেশে। ভেবেছিলাম, এ তো কোনও ভ্রমণবিলাসীদের ঘুরতে যাওয়ার জায়গা নয়, ফলে কোনওরকম ভ্রমণকথা আমি লিখতে পারব না কোনও ম্যাগাজিনে বা খবরের কাগজে। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর মনে হল যে, কোথাও না লিখি, তবু এই অসম্ভব সুন্দর অভিজ্ঞতা ভাষায় একবার বর্ণনা করার চেষ্টা করা গেলেও যেতে পারে।

ডিসেম্বর মাসের পড়ন্ত বিকেল, তিনবিঘা পেরিয়ে আরও ১৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর এই ক্যাম্প। শুরু হওয়ার বেশ খানিকটা আগে থেকেই দেখছি সশস্ত্র বাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি চতুর্দিকে, কেউ কেউ সরকারি গাড়িকে সংবর্ধনাসূচক স্যালুট দিচ্ছেন। নিরাপত্তা দিচ্ছেন। নিরাপত্তার বেষ্টনী পার করে যেখানে একটা ছুঁচও গলতে পারবে না, সেখানে প্রবেশ করলাম। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের সর্বশেষ বিএসএফ ক্যাম্প এটি।

গাড়ি থামল যেখানে, সেখানে একটা গোলমতন বসার ঘর বানানো, কাঠের তৈরি। ওইটুকু ঘেরা জায়গাকেই এত সুদৃশ্য এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা যায় তা এঁদের কাছ থেকে শেখার মতো। পাশেই নদী, ওপারে বাংলাদেশ। সূর্য ডুবছিল আস্তে আস্তে, যেন থেমে ছিল আমাদেরই অপেক্ষায়। কমলা-হলুদ-লাল মিলেমিশে নদীতে মাখিয়ে দিল কত দ্রুত, অয়েল পেইন্টিং-এর মতো। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু হাওয়া আর নদীর জল কথা বলছে দু'জনে মিলে, কী দারুণ তাদের গলার স্বর!

হাসিমুখে আমাদের স্বাগত জানালেন ওঁরা। বাইরের বসবার জায়গায় বসতে বলে গ্লাসে গরম জল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হল। আতিথেয়তার বিষয়ে যতই বলা হোক তা কমই হবে। ভিতর থেকে অনুরাধা পড়োয়ালের ভজন ভেসে আসছিল। ছোট্ট একখানা মন্দির, যার পরিবেশ ভাল লাগাতে বাধ্য করবে একরকম। সব দেবী-দেবতাই ওখানে রয়েছেন ছবিতে। দেবী কালীর মূর্তি শক্তির উৎস রূপে পূজিত।

পরবর্তীতে কফি আর ওঁদের বাগানের পালংপাতা, ফুলকপি, আলুর পকোড়া সহযোগে কথা বলছিলাম, আর শুনছিলাম ওঁদের পরিবারের কথা, বাড়ির কথা। কত দূর দূর থেকে এসে এখানে ওঁরা আছেন বাড়ি ছেড়ে তা ভাবছিলাম। কেউ হিমাচলপ্রদেশ, কেউ রাজস্থান, কেউ মধ্যপ্রদেশ তো কেউ বিহার। আমাদের পেয়ে ওঁদের আনন্দ বলে বোঝানো যাবে না। হয়ত নিজেদের পরিবার, ছেলেমেয়ে, বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। হয়ত নয়, সত্যিই তা-ই। আমার মেয়ে প্লেটের সস নিয়ে খেলছিল বলে গরম জল দিয়ে হাত ধুইয়ে দুধসাদা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিল। তা দেখে এত ভাল লাগল যে বলার নয়।

ওই নিঝুম চারধারে আমাদের উপস্থিতিতে তাঁরা খুবই আনন্দিত হয়েছেন— এ কথা বারে বারে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর বলেছেন আবার একদিন আসবার কথা। সত্যিই তা-ই। এই জনমানবশূন্য নির্জন সীমান্তে জওয়ানরা প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছেন আমাদের। পরিবার, আত্মীয়স্বজনের থেকে কত মাইল-ক্রোশ দূরে, ফেসবুক, হোয়াট্‌সঅ্যাপের জগৎ থেকে ছিটকে এক অন্য জগতে।

হিমি মিত্র রায়

কাজীমান গোলে

কালচিনি রেল স্টেশন, লেবেল ক্রসিং, বটতলা, নিত্য কোলাহল-কলরব। সামান্য হাঁটা-পথে দোকান-পসার ছাড়িয়ে গেলে শতাব্দীপ্রাচীন ঝাপরা কড়ি গাছের জঙ্গল। ডান দিকে জরাজীর্ণ চা-বাগান। কালচিনি, রায়মাটাং, সোজা গেলে চুয়াপাড়া, সেচপাড়া, রাধারানি ছুঁয়ে পানা নদী পার হলে রাঙামাটি চা-বাগান। চারপাশের ভূচিত্র আমার মুখস্থ। চোখের উপরে ভাসে। ময়নাগুড়ির সনৎদার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো। বক্সা-ডুয়ার্স ক্লাবের কৌলীন্য লুপ্ত। বাঙ্গারামের বাগানে পরিণত। এ কথা না বললেও চলত, কিন্তু আবেগতাড়িত হয়ে লিখে ফেলি। পুনরাবৃত্তি ঘটে যায়। এলোমেলো হয়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ স্মৃতিমালা। কাজীমানের কথাই ঘুরে-ফিরে আসে। মাত্র ক'দিন আগে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন আমার প্রিয় বুড়োদা, সকলের আপনজন গাঙ্গুটিয়ার সনৎদা। বছর ঘুরতে চলল কাজীমানের চলে যাওয়া।

এমন ডুয়ার্সপ্রেমী মানুষ কোটিতে গুটিকয় বলা যায়। খুবই সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন কাজীমান গোলেমশাই। আমার সমবয়সি। সতত হাসিখুশি প্রকৃতির। স্বপ্ন দেখতেন কালচিনিতে পর্যটকদের জন্য হোমস্টে গড়ে তোলার। সামান্য পাতি তোলার কাজ করতেন। তারপর ধীরে ধীরে নিজের যোগ্যতায় উন্নতি করেন। সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ, প্রাপ্য/গন্ডা সর্বস্ব ঢেলে তৈরি করেন ডুয়ার্স সংগ্রহশালা। সরকার যাহা পারে নাই, কাজীমান তাহাই করে দেখান। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়। দধীচি মুনির মতন— কী হবে গৌরীবাবু টাকাপয়সা দিয়ে? দুটো ডাল-ভাত জুটে যাবে। আমার দু'টি ছেলে কৌশল, কুবীর আছে। ওরা দেখবে। আমি মনের মতো সংগ্রহশালা সাজাব। আপনারা পাশে থাকুন।

ধর্মে বৌদ্ধ। তামাং সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও কোনওরকম ছুঁতমার্গ ছিল না। তাঁর লেখা 'লাইফ অ্যান্ড সিকেন' চা-বাগানের সুখ-দুঃখের চালচিত্র। 'মু হিমাল' পথনাটক খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। নেপালি ভাষায় প্রচুর গদ্য-পদ্য লিখেছেন। বাকপা নাচ, তামাংদের মুখোশ নাচ ছেলেমেয়েদের ট্রেনিং দেন। ১৫ জনকে নিয়ে বাকপা নাচের দল গঠন করেন। যে দিন ডুয়ার্স সংগ্রহশালা উদ্‌বোধন হয়, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী সন্তুষ্ট হয়ে ২৫ হাজার টাকা এবং বাগান মালিক ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহশালার তহবিলে দান করেন। জমকালো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়। খাদা পরিয়ে উপস্থিত সম্মাননীয় ব্যক্তিবর্গকে বরণ করে নেন। ডুয়ার্সের আলোকচিত্র, বাদ্যযন্ত্র, মুখোশ— বহুবিধ সম্ভারে সংগ্রহশালাটি দিনে দিনে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। নানা ভাষাভাষী পর্যটকরা আসছেন। মুগ্ধ বিস্মিত হচ্ছেন। কাজীমানের উদ্যম-পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে যাচ্ছেন। ভিজিটরস' নোটবুক পড়লে বোঝা যায় মানুষের ভালবাসা, সমর্থন।

কাজীমানের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কয়েক দশক আগে বক্সা পাহাড়ের পাদদেশে সান্তরাবাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'গৌরীবাবু, আপনার লেখা পড়ি। ডুয়ার্সকে আপনি কী সুন্দরভাবে হাইলাইট করছেন। একবার কালচিনিতে আসুন। আমার বাড়িতে থাকবেন। আপনাকে চা-বাগানের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করাব।' কাজীমানকে আলোকিত করেছে বন্ধু প্রমোদ নাথ। আদিবাসী বলয়ে প্রমোদ নীরবে কাজ করে চলেছে। প্রমোদ সহযোগী হিসেবে পেয়েছিল কাজীমানকে। পরবর্তীকালে লেখক ইন্দ্রবাহাদুর গুরুঙের পরিচয় হয়। বর্ষীয়ান এই মানুষ নেপালি সাহিত্য-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করে চলেছেন। আরও অনেকের কথা মনে পড়ে, যেমন রামকুমার লামা। গাঙ্গুটিয়ার সনৎদা। মিতভাষী, পরম বিনয়ী রামকুমারের মতন মানুষ পৃথিবীতে কম দেখা যায়।

একবার আঠাশ মাইল বনবস্তিতে দেশ-বিদেশের পর্যটক, ভ্রামণিকরা সমবেত হয়েছিলেন কনকনে ঠান্ডার সময়। অনুষ্ঠানের সহযোগী ছিল হেল্প টুরিজম সংস্থা। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল দুর্গা অধিকারীর হোমস্টে শঙ্খচিল-এ। পৌঁছে দেখি স্থানীয় নেপালি ছেলেমেয়েদের নাটক, গান, নাচের তালিম দিচ্ছেন গোলেবাবু। সম্মুখে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সরষে খেত। মধ্যিখানে নজর মিনার, দূরে সিঞ্চুলা পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা, সম্মুখে সবুজ বনানী। দারুণ অ্যাম্বিয়েন্স। অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ। ভুলতে পারব না সে দিনের মধুময় স্মৃতি। গভীর একাগ্রতার সঙ্গে ভুলত্রুটি সংশোধন করছেন। দুষ্টুমি করলে বকুনি। তাঁরই লেখা, সুর দেওয়া গান (আমার ভুল হতে পারে)— 'স্বাগত হোজুর লাই হাসি ডুয়ার্সবাসী হো/স্বাগত এজুর লাই হাসি ভারতবাসী হো।' আশপাশের গ্রাম বস্তি তো বটেই, কাতলুং, লেপচা খা, চুনাভাটি, সান্তরাবাড়ি, বক্সা, জয়ন্তি, রাজাভাতখাওয়া থেকে হোমস্টের মালিকরা উপস্থিত হন। তাঁদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ-অভিমান নিয়ে আলোচনা, চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়। সভাপতি ছিলেন প্রবীণ কথাসাহিত্যিক ইন্দ্রবাহাদুর গুরুং। ছেলেমেয়েদের নাচ-গান-নাটক উপভোগ করি। পরিচালনায় কাজীমান গোলে। সন্ধ্যায় নিচে আগুন জ্বেলে নাচ। জার্মান ভ্রমণ লেখক স্টিফেন লুজে, শ্রীমতী লুজে, রদমন বালি, আমি, আরও অনেকে মিলে বুড়ো বয়সের নাচানাচিতে অনেক মজা পেয়েছিলাম। দারুণ উপভোগ্য ছিল দু'টি দিন।

আবার আঠাশ মাইলে অনুষ্ঠান। সেবার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল রামকুমার লামার কাঠের দোতলার সামনে। দিনের বেলায় প্যান্ডেল তৈরি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। বিকেলের দিকে আমি আর কাজীমান জঙ্গলের ভিতরে চলে বেড়াই। কাঠের গুঁড়িতে, না হলে মাঠে বসে গল্প হত। কথায় কথায় বলতেন, ডুয়ার্স সংগ্রহশালাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আপনারা পাশে থাকবেন, মদত দেবেন। আগামী প্রজন্ম যেন জানতে পারে, বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে ডুয়ার্সকে। আমি থাকব না, আপনিও একদিন চলে যাবেন, আমার সৃষ্টি এই সংগ্রহশালাটা তো থাকবে। ছোট্ট শিল্প আজ হাঁটতে শিখেছে। অনেকে এগিয়ে এসেছেন ভালবেসে। সরকারিভাবে সাহায্য পেলে সংগ্রহশালা আরও মজবুত হত। সমৃদ্ধ হত বাকপা নাচের প্রতিষ্ঠান। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি এত নজর দিয়েছেন। পাহাড়ের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জন্য বডি তৈরি করেছেন। ঢালাও অর্থ বরাদ্দ করেছেন ডুয়ার্স সংগ্রহশালার প্রতি। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আচমকা খবর এল গোলের ছেলের কাছ থেকে— 'বাবা চলে গেলেন।' একটু বাদে আলিপুরদুয়ার থেকে প্রমোদ খবর দেয়— 'গৌরীদা, কাজীমানদা আমাদের ছেড়ে চিরকালের মতন বিদায় নিয়েছেন।' বেঁচে থাকুক ডুয়ার্স সংগ্রহশালা— কাজীমান গোলের স্বপ্ন।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস
চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-৯। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।
কবিসম্মেলন! শুনেছি কবিরা নিরীহ হয়। দেখি তো!
বাঃ! এই তো!
এর চাইতে নিরাপদ জায়গা আর কী হতে পারে?
তখন সম্মেলনে
ডুয়ার্স কবি সম্মেলন
এখন চা-পানের বিরতি। তারপর বিশেষ অধিবেশন।
সেই অধিবেশনে থাকছেন কবিশ্রেষ্ঠ পুরন্দর ভাটের শিষ্য—
কলকাতা কাঁপানো কবি চালুক্য পুলকেশী!
?!
তালি
তালি
কবির আসরে এক অকবি।
TEA STALL
বাহ্! মুফতে চা-ও মিলছে!
আপনার সঙ্গে তো আলাপ হয়নি ভাইটি!
আমি 'অ্যান্টিভাইরাস' পত্রিকার সম্পাদক ভৈরব বাগচি। আপনি বুঝি নতুন কবি?

EKHON DUARS, Vol-4, Issue-3 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস

কাহিনি : বৈকুণ্ঠ মল্লিক, ছবি : দেবরাজ কর

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.